বিচারপতি মুফতি মুহাম্মদ তকী ওসমানী

ইসলাম আধুনিক রাজনীতি

আ. ক. ম. আশরাফুল হক

ইসলাম ও আধুনিক রাজনীতি

মূল

বিচারপতি মুফতি মুহাম্মাদ তকী ওসমানী

অনুবাদ

আবুল কাসেম মুহাম্মাদ আশরাফুল হক

আলেম, লেখক ও অনুবাদক

দারুল হক প্রকাশনী
[একটি সৃজনশীল প্রকাশনী প্রতিষ্ঠান]
১১০ আলীজা টাওয়ার (৩য় তলা)
ফকিরাপুল, ঢাকা-১১০০

www.pathagar.com

ইসলাম ও আধুনিক রাজনীতি

মূল: বিচারপতি মুফতি মুহাম্মাদ তকী ওসমানী
অনুবাদ: আবুল কাসেম মুহাম্মাদ আশরাফুল হক
মোবাইল : ০১৯১১৮২৪৬১৮

প্রকাশক
এহসানুল হক, এনামুল হক,
মনসুরুল হক, তাকিয়া ও আশফা

প্রকাশকাল
রমযান ১৪৩০ হিজরী
ভাদ্র ১৪১৬ বাংলা
সেপ্টেম্বর ২০০৯ ঈসায়ী

[সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

অক্ষর বিণ্যাস
আল আশরাফ কম্পিউটার্স

মূল্য : আশি টাকা মাত্র

www.pathagar.com

উৎসর্গ

যার মাধ্যমে এদেশে ইসলামী রাজনীতি প্রবর্তন হয়,
সেই সফল রাজনীতিবিদ ও মহান ইসলামী ব্যক্তিত্ব,
হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহ.)-এর অন্যতম
খলীফা শাইখুল ইসলাম হযরত আল্লামা
আতহার আলী (রহ.)-এর উদ্দেশ্যে।

www.pathagar.com

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও সাহিত্যিক দৈনিক ইনকিলাবের সহকারি সম্পাদক মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভীর

অভিমত

ইসলাম ও আধুনিক রাজনীতি একটি উন্নমানের কিতাব। বাংলাদেশে পাঠকপ্রিয়তা পাবে বলে আশা করা যায়। বইটির তরজমা অনেক উন্নত ও সুন্দর হয়েছে। বিষয়বস্তু একটু কঠিন হলেও বর্ণনার সাবলীলতা আর লেখকের জনপ্রিয়তায় সমস্যা কেটে যাবে। অনুবাদক পূর্ণ যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিয়েছেন। মুদ্রিত আকারে এমন বই হাতে পেলে চিত্ত আনন্দিত হয়। বাংলাভাষায় আমাদের অনেক কাজ করার আছে। এ বইটির প্রকাশনাও এ পর্যায়ে একটি মৌলিক অবদান বলে বিবেচিত হওয়ার দাবি রাখে।

বইটি বর্তমান বিশ্বের অন্যতম সেরা আলেম ও ইসলাম প্রচারক বিচারপতি আল্লামা মুহাম্মাদ তকী ওসমানী সাহেবের কিছু মূল্যবান নিবন্ধের সংকলন। তকী ওসমানী সাহেবের তো সব লেখাই মূল্যবান। তথাপি এ লেখাগুলো বিশেষভাবে মূল্যবান বলার কারণ হলো, এসব লেখা আধুনিক যুগের মানুষকে ইসলামের ব্যাপকতা সম্পর্কে ধারণা দেয়। আল্লামার লেখার ষ্টাইলও অসাধারণ। একটি সাময়িক প্রসঙ্গ নিয়ে কথা শুরু করে সেটিকে এর গভীর তত্ত্বে নিয়ে শেষ করেন। পত্রিকার সম্পাদকীয় হিসাবে লেখা নিবন্ধেও তিনি বিভিন্ন বিষয়ের মূলনীতির উপর এমন আলোচনা করে ফেলেন, যা একটি শাস্ত্রীয় গ্রন্থ রচনার বেলায়ই অন্যসব ফকীহরা করে থাকেন।

অনেক সময় আমরা তাঁর বইয়ের শিরোনাম দেখে এটিকে একটি ভাব-গম্ভীর থিসিস টাইপ গ্রন্থ মনে করে খুলি। পরে দেখতে পাই এটি কোন নিবন্ধ সংকলন বা বক্তৃতাসংগ্রহ। এ সময়ই আবার মনে হয় তকী সাহেবের ষ্টাইলই তো এমন যে সহজ করে কথা শুরু করে এর শেষ পর্যন্ত নিয়ে ছাড়েন। যাক্ এ বইটিও এমনি একটি কঠিন বিষয়ের সাবলীল উপস্থাপনা। নতুন যুগের অনুসন্ধিসু পাঠক এতে নতুন অনেক তথ্য ও ভাবনা পাবেন।

www.pathagar.com

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক ও গবেষক
প্রফেসর ড. আ. ফ. ম খালিদ হোসেন-এর

অভিমত

বর্তমান বিশ্বের খ্যাতিমান আইন বিশেষজ্ঞ বিচারপতি মুফতি তকী ওসমানী লিখিত 'ইসলাম ও আধুনিক রাজনীতি' শীর্ষক গ্রন্থটি দেখেছি। বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের এক শ্রেণীর মানুষ প্রচলিত নির্বাচনে অংশ গ্রহণ ও ভোটাধিকার প্রয়োগকে শরীয়ত সম্মত মনে করেন না। তাদের মতে এসব দুনিয়াবী কাজ। আল্লামা তকী ওসমানী 'নির্বাচনে জনগণের দায়িত্ব' ও 'ইসলামের দৃষ্টিতে ভোটের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা' এ উপ-শিরোনামদ্বয়ের আওতায় বিষয়টিকে যৌক্তিক ও ইতিবাচক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণের প্রয়াস পেয়েছেন। যেকোন দেশের জাতীয় নির্বাচন কেবল সরকার পরিবর্তন করে না, রীতি-নীতি, আইন-বিধি ও রেওয়াজ-সংস্কৃতিরও পরিবর্তন ঘটায়। যোগ্য, সৎ, ও দ্বীনদার মানুষের হাতে ক্ষমতা না গিয়ে বিপরীত চরিত্রের মানুষের হাতে যদি কর্তৃত্বের বাগডোর যায় অবস্থা কি ভয়ানক হতে পারে তার উদাহরণ ভুরিভুরি। ফলে নির্বাচন ও ভোট প্রদানের গুরুত্ব ও তাৎপর্যকে কোনভাবে খাটো করা যাবে না। আল্লামা ওসমানীর বিশ্লেষণের ফলে এ বিষয়টি পরিস্কার হয়েছে যা অনেকের ভ্রান্ত ধারণার পরিসমাপ্তি ঘটাবে।

দ্বিজাতিতত্ত্ব ভারতীয় উপমহাদেশের আরেকটি বিতর্কিত বিষয়। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে, পাকিস্তান না হলে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হতো না। পশ্চিম বঙ্গ বা আসামের মতো দিল্লীর অধীনে থাকতে হতো আমাদের। আল্লামা ওসমানী এ বিষয়টিকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করার প্রয়াস পেয়েছেন। বক্ষ্যমান গ্রন্থে বিজ্ঞ লেখক "মুসলিম জাতীয়তাবাদ ও আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, দেশ প্রেম ও স্বজন প্রীতি, বাংলাদেশের স্বাধীনতা, আমেরিকা ও ইসলাম, তুরস্কের নব জাগরণ, বায়তুল মুকাদ্দাসের পতণের কারণ, মুসলিম বিশ্বের মূল সমস্যা, মুসলিম বিশ্বের ঐক্য ভাবনা' উপ-শিরোনামে আধুনিক

www.pathagar.com

রাজনীতির গতিধারা, ইরান, তুরস্ক ও আরব দেশের প্রেক্ষাপটে জাতীয়তাবাদের উত্থান, বিকাশ ও তার নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া, মুসলিম বিশ্বের বিভাজন প্রভৃতি বিষয়গুলোকে নিবিড় পর্যবেক্ষণের পাদপ্রদীপে নিয়ে আসেন।

আমার স্নেহভাজন জনাব আ. ক. ম আশরাফুল হক বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি উর্দূ হতে ভাষান্তর করে এক বিরাট খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। তাঁর এ উদ্যোগী ভূমিকা প্রশংসার দাবীদার। আলোচ্য গ্রন্থের বেশ ক'টি নিবন্ধ ইতোমধ্যে 'দৈনিক ইনকিলাব' এ প্রকাশিত হয়ে বিদগ্ধজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে। অনুবাদ সহজ ও মার্জিত। মুদ্রণজনিত কিছু প্রমাদ রয়েছে, পরবর্তী সংস্করণে এর সংশোধনে অনুবাদক সতর্ক দৃষ্টি দেবেন– এটাই প্রত্যাশা।

আমি গ্রন্থটির ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা কামনা করি। দু'আ করি আল্লাহ তা'য়ালা যেন অনুবাদককে সাহিত্যাঙ্গনে আরো বৃহত্তর খিদমত আঞ্জাম দেয়ার তাওফিক দেন। আমীন।

(ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন)
সম্পাদক,
মাসিক 'আত-তাওহীদ'
অধ্যাপক,
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ওমর গণি এম. ই. এস কলেজ
চট্টগ্রাম-৪২২৫

www.pathagar.com

অনুবাদকের কথা

ইসলাম শ্বস্যত ও পূর্ণাঙ্গ একটি জীবন বিধান। জীবনের প্রতিটি পদে পদে যার রয়েছে আদর্শ এবং নিজস্ব দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি। ব্যক্তিগত ও সামাজিক পরিসরে যেমন রয়েছে এর স্বকীয় মতবাদ। তেমনি অর্থনীতি, সমরনীতি ও রাজনীতিতেও এর আপন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। এই সামগ্রীক দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়ন করে এক সময় মুসলমানরা প্রায় গোটা বিশ্ব বীরদর্পে শাসন করেছে। সৃষ্টি করেছে আদর্শ, শান্তি ও নিরাপত্তার নতুন ইতিহাস। কিন্তু কালক্রমে মুসলমানরা জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে সেই সামগ্রীক ও ব্যাপক চিন্তাধারা থেকে সরে আসে এবং ইসলামকে সংকীর্ণকরে অনুধাবন করতে শুরু করে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই মুসলমানদের রাষ্ট্রসীমানা সঙ্কোচিত হতে থাকে এবং ধীরে ধীরে তা একেবারে শুন্য কোঠায় এসে পৌঁছে। এমনকি যেসব এলাকা এখনও তাদের আওতাধীন সেখানেও এই সংকীর্ণতা বিরাজমান। আধুনিক উত্তরকালে তা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে, এবং ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পৃথিবীতে বহু মত ও আদর্শ রয়েছে। বহু ধর্ম ও মতবাদ রয়েছে। তবে ইসলাম ছাড়া কোনকিছুই পূর্ণাঙ্গ নয়। কোন ধর্ম ও মতবাদই ব্যক্তি থেকে সমষ্টি পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত নয়। কিছু মতবাদ বা ধর্ম শুধুমাত্র ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ আর কিছু মতবাদ শুধু সমষ্টির মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু ইসলাম একমাত্র ব্যতিক্রমধর্মী মতবাদ হওয়ায় ওদের যত গাত্রদাহ। তাই ইসলাম যাতে রাষ্ট্রীয়ভাবে কায়েম না হয় এ জন্যে যুগ যুগ ধরে ইসলাম বিরোধীরা যাবতীয় সবকিছুর আয়োজন করে আসছে। আর এজন্যে ওরা বিভিন্ন থিম ও থিওরী উদ্ভাবন করেছে গণন্ত্র (Democracy) সমাজতন্ত্র (Communism) ধর্মনিরপেক্ষতা (Secularism) ও জাতীয়তাবাদ (Nationalisn) এরই ধারাবাহিকতায় সৃষ্ট। এসব বস্তুবাদী মতবাদ যে কখনও মুসলমানদের জন্য কল্যাণ ও উন্নতি বয়ে আনতে পারে না। বরং তাদেরকে কেবল অধপতিত করেছে, ধ্বংসের দিকে ধাবিত করেছে।

আন্তর্জাতিক ইসলামী চিন্তাবিদ মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সির ও সাবেক বিচার পতি মুফতি মুহাম্মাদ তকী উসমানী তাঁর اسلام اور سیاست حاضرة বইয়ে এসব বিষয় সুষ্ঠুভাবে তুলে ধরেছেন। গত দু'শ বছর যাবত মুসলিম বিশ্বের

www.pathagar.com

অধপতনের মূল কারণ সমূহ সুনিপূণভাবে চিহ্নিত করেছেন এবং এই ধ্বংযজ্ঞ থেকে উত্তরণেরও ব্যবস্থা বাতলিয়েছেন।

সমগ্র বিশ্বব্যাপি লেখককে মূলত ইসলামী আইনজ্ঞ হিসেবেই জানে। কিন্তু এই বই তাকে রাজনীতি বিশেষজ্ঞ হিসেবেও নতুন এক পরিচিতি এনে দিয়েছে। বইটি মূলত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঘটনা ও ইস্যুকে কেন্দ্র করে লিখিত বিভিন্ন প্রবন্ধ মালার সমন্বিত রূপ। যে প্রবন্ধসমূহ দেশ বিদেশের বিভিন্ন দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত এবং ব্যাপকভাবে পাঠক সমাদৃত।

সাধারণত ইস্যুকেন্দ্রিক লেখা পরবর্তীতে তেমন গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা রাখে না। কিন্তু বিচারপতি তকী ওসমানীর এই বইয়ের লেখাগুলো যদিও কোন না কোন ইস্যুকে কেন্দ্র করে শুরু করেছেন তবুও ইস্যুটিকে বিষয়ের দিকে টেনে নিয়ে গেছেন এবং ঐ ইস্যুর অর্ন্তনিহিত বিষয়টিকে অত্যন্ত সাবলীলভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। যার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কখনও ম্লান হওয়ার নয়। সর্বকাল ও যুগে যার প্রয়োজন পড়বে। এখানেই বর্তমান বিশ্বের অন্যান্য ইসলামী চিন্তাবিদদের সাথে বিচারপতি তকী ওসমানীর ফারাক ও পার্থক্য।

লেখকের উন্নত চিন্তা ও মানসম্পন্ন রচনাশৈলী অতুলনীয়। যা আমার মত লোকের পক্ষে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। বরং এমন লেখকের বইয়ের অনুবাদে হাত দেয়া দুঃসাহসও বটে। তবে বিষয়বস্তুর প্রতি আমার অতি উদগ্রীবতা এই দুরূহ কাজে প্রেরণা যোগিয়েছে। আশা করব শত চেষ্টার পরও অনুবাদে কোন ধরণের ভুল-ত্রুটি হলে সম্মানিত পাঠকগণ ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

অনুবাদের বেশ কিছু অংশ বিভিন্ন শিরোনামে দৈনিক ইনকিলাবে বিভিন্ন কিস্তিতে 'স্বদেশ বিদেশ' ও 'ধর্ম-দর্শন' পাতায় প্রকাশিত হয়েছে এবং পাঠকদের কাছেও বেশ সমাদৃত হয়েছে। এখন বই আকারে পাঠকদের হাতে তুলে দিলাম। বইটি প্রকাশে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক আল হাজ্জ মাওলানা দেলাওয়ার হোসেন কাসেমীর সহযোগিতা ও প্রেরণা বিশেষ ভাবে স্মরণযোগ্য। এছারা আরও যারা যেভাবে সহযোগিতা করেছেন সবাইকে আল্লাহপাক উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন। এ বইয়ের আলোকে যাতে আমরা বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনকে ইসলামী করণ করতে পারি আল্লাহপাক যেন আমাদেরকে এই তৌফিক দান করেন। আমীন!

www.pathagar.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
নির্বাচনে জনগণের দায়িত্ব	১১
ইসলামের দৃষ্টিতে ভোটের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা	১৮
ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থা	২৬
মুসলিম জাতীয়তাবাদ ও আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা	৩১
দেশপ্রেম ও স্বজনপ্রীতি	৩৬
স্বজনপ্রীতির কারণ ও সমাধান	৪৫
বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও দ্বি-জাতিতত্ত্ব	৪৯
ইরানের আড়াই হাজার বছর পূর্তি উৎসব	৫৫
আমেরিকা ও ইসলাম	৬১
তুরস্কে নবজাগরণ	৬৮
বায়তুল মুকাদ্দাসের পতনের কারণ	৭৯
বায়তুল মুকাদ্দাসের ইতিহাস	৮২
মুসলিমবিশ্বের মূল সমস্যা	১০০
মুসলিমবিশ্বের ঐক্য ভাবনা	১০৯

www.pathagar.com

আমাদের প্রকাশিত শায়খুল হাদীস মাওলানা শামসুল হক দৌলতপুরী কর্তৃক রচিত ও সংকলিত কয়েকটি বই

১. তাফসীরে আহকামুল কোরআন।

(আহকামের পাঁচশ' আয়াতের ব্যাখ্যা সম্বলিত)

২. টেলিভিশনের লাভ-ক্ষতি।

৩. পকেট মাসনূন দু'আ।

www.pathagar.com

নির্বাচনে জনগণের দায়িত্ব

নির্বাচন আসলে সরকার ও বিরোধী দলগুলোর মধ্যে প্রচণ্ড নির্বাচনী উত্তপ্ততা বিরাজ করে। নির্বাচন যে কোন দেশে এক বিরাট পরিবর্তন আনতে সক্ষম। আর সে পরিবর্তন কত ভয়ানক ও বিপজ্জনক হতে পারে– তা এই জাতিই সব থেকে বেশী অনুভব করার কথা। সরকারের সমালোচনা যে কোন আদর্শ রাষ্ট্রে জনগণের স্বীকৃত মৌলিক নাগরিক অধিকার। এ অধিকারের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু আজ খোলা মনে একথা স্বীকার করতে হবে যে, অতীতে আমরা এই অধিকার প্রদানের নামে তালবাহানা করে নিজেদের দুর্বলতাকেই কেবল আড়াল করার চেষ্টা করেছি। বস্তুত শাসকশ্রেণী যে প্রকৃতপক্ষে আমাদেরই কার্য-কলাপের আয়নাস্বরূপ এ ভাবনা একেবারেই ছিল না। যারা অর্থের বিনিময়ে ভোট ক্রয় করে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা অর্জন করে, নিঃসন্দেহে তারা ভর্ৎসনার যোগ্য এবং নিন্দার পাত্র। তবে এদের এই অপরাধে ঐসব জনগণও সমান অংশীদার, যারা অর্থের লোভে দেশ, জাতি, দীন ও ন্যায়-নীতিসহ সবকিছু ভুলে যায়। অতঃপর তাদের ভোট ক্রেতারা যখন ক্ষমতার মসনদে বসে সমগ্র জাতির রক্ত চুষে খাওয়া শুরু করে, তখন তারা নিজেদের কৃতকর্মের প্রতি লক্ষ না করে সমালোচনার অধিকারের অজুহাতে সরকারের প্রতি অশ্রদ্ধাশীল, আনুগত্যহীন এবং সর্বোপরি বিদ্রোহী হয়ে উঠে। বর্তমান সংসদীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যেই ক্ষমতাসীন হচ্ছে, নির্বাচনের মাধ্যমেই তাকে ক্ষমতার মসনদে আসতে হচ্ছে। ফলে সরকারের যাবতীয় কার্যক্রম সেসব জনগণকেই কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় যারা তাদেরকে নির্বাচিত করে। যাদের ইহকালীন ও পরকালীন দায়-দায়িত্বের বিরাট এক অংশ সরকারের উপরই বর্তায়।

সুতরাং জাতীয় নির্বাচন কোন খেল-তামাশা নয়। অবহেলারও কোন সুযোগ নেই। বরং তা জাতির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এক দায়িত্ব ও কর্ম। তাই সঠিকভাবে বুঝে শুনে এবং সততা ও সুবিবেকতার সাথে এ মহান দায়িত্ব

www.pathagar.com

পালন করা দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য ফরয। আমি কোন রাজনীতিবিদ নই। তবে ইসলাম জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র ও আঙ্গিনার মত এ ক্ষেত্রেও নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি এবং কিছু মৌলিক দিকনির্দেশনা প্রদর্শন করেছে। এই স্বাতন্ত্র্য দৃষ্টিভঙ্গি ও দিক নিয়েই সংক্ষিপ্ত এ আলোচনা।

শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গিতে ভোট একটি শাহাদাত বা সাক্ষী। কাউকে ভোট দেয়ার অর্থ তার সম্পর্কে এ সাক্ষ্য দেয়া যে, সে আপনার দৃষ্টিতে সংসদের সদস্য এবং ক্ষমতার যোগ্যতম ব্যক্তি। আর আপনার নির্বাচনী এলাকায় আপনার মতে এ পদের জন্য তার চেয়ে অধিক যোগ্যতার দ্বিতীয় আর কেউ নেই। সুতরাং ভোটের ক্ষেত্রে শরীয়তের দৃষ্টিতে ঐসব আহকাম বা বিধি-বিধানই প্রয়োগ হবে– শাহাদাত বা সাক্ষীর ক্ষেত্রে যা হয়। অনেক এমন আছে যারা ইসলামকে শুধুমাত্র নামায, রোযার মধ্যেই সীমাবদ্ধ বলে বিশ্বাস করে। ফলে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি ও শিক্ষা-সংস্কৃতিসহ যাবতীয় দৈনন্দিন কার্যক্রম থেকে তারা ইসলামকে সম্পূর্ণ পৃথক মনে করে এবং এসব ব্যাপার ইসলামের নিয়ন্ত্রণাধিকার থেকে পুরো স্বাধীন হিসেবে তাদের কাছে গণ্য। আশ্চর্যের ব্যাপার, এমনও কিছু লোক আছে যারা ব্যক্তি জীবনে নামায, রোযা, দরূদ ও অযিফার নিয়মানুবর্তিতায় বদ্ধপরিকর। অথচ ব্যবসা-বাণিজ্যে কোন প্রকার হালাল-হারামের ধার ধারে না। শিক্ষা-সংস্কৃতি ও রাষ্ট্র পরিচালনায় ইসলামের বিধি-বিধানের অনুসরণ করে না। বিবাহ, তালাক ও আত্মীয়তার ক্ষেত্রে ইসলামের বিধি-নিষেধ– এর কোন পরওয়া করে না। এসব লোকজনই নির্বাচনকে শুধুমাত্র দুনিয়াদারী বিষয় মনে করে তাতে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। অথচ সে অনুভবও করতে পারছে না যে, তার দ্বারা এক বিরাট অন্যায় বা পাপ সংঘটিত হয়ে গেল। যদ্বরুন অনেকেই ভোট প্রদানে তার একান্ত নিজস্ব মতামত ও সুবিবেচকতার প্রতিফলনে ব্যর্থ হয়ে শুধু জাতিগত সম্পর্কের ভিত্তিতে কোন অযোগ্য পাত্রে তার মূল্যবান ভোটটি দিয়ে দেয়। অথচ সে ভাল করেই জানে, সে যাকে ভোট দিচ্ছে ঐ ব্যক্তি আদৌ ভোট পাওয়ার যোগ্য নয়; বরং তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীই ভোট পাওয়ার অধিক যোগ্যতর বা হকদার। তারপরও শুধু বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা বা বাহ্যিক ও সাময়িক শিষ্টতা,

www.pathagar.com

ভদ্রতা ও স্বার্থের কারণে মূল্যবান ভোটের ভুল প্রয়োগ বা ব্যবহার করছে এবং সে অনুধাবনও করতে পারছে না যে শরীয়ত ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তার দ্বারা কত মস্তবড় অন্যায় ও পাপ সংঘটিত হয়ে গেল।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভোট একটি শাহাদত বা সাক্ষী। সে প্রসঙ্গে পবিত্র আল কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذاقربى

অর্থ: "যখন তুমি কোন কথা (সাক্ষ্য দাও) বল তখন ইনসাফ বা সততা ও ন্যায়-নীতি বজায় রাখ। যদিও সে (যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়া হচ্ছে) তোমার নিকটাত্মীয় হয়।" (সূরা আন-আম, আয়াত-১৫৩)

যখন কোন ব্যক্তির ব্যাপারে মন ও বিবেক সততার দৃষ্টিকোণ থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হবে যে, এই প্রার্থী ভোট পাওয়ার যোগ্য নয়; বরং তার প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য প্রার্থী অধিক যোগ্যতর। এক্ষেত্রে শুধু জাতিগত কারণে বা ব্যক্তিস্বার্থ সিদ্ধ করতে তাকে ভোট দেয়া মিথ্যা সাক্ষী দেয়ার শামিল। পবিত্র আল কোরআনে মিথ্যা সাক্ষ্যের এমন কঠোর নিন্দা করা হয়েছে যে, একে মূর্তিপূজার সমতুল্য বর্ণনা করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে–

فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور

অর্থ: "তারপর তোমরা মূর্তিদের অপবিত্রতা থেকে দূরে থাক এবং মিথ্যা কথা (সাক্ষ্য) থেকে মুক্ত থাক।" (সূরা হজ্ব, আয়াত-৩০)

এছাড়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও বহু হাদীসে মিথ্যা সাক্ষীকে কবিরাহ্ গুনাহ্সমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং এ ব্যাপারে কঠোর ভীতি প্রদর্শন করেছেন। হযরত আবু বকর (রাযি.) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছিলেন–

"আমি কি তোমাদেরকে বড় বড় গুনাহসমূহ বলে দেব? আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্যতা, শুন! ভাল করে শুনে রাখ! মিথ্যা সাক্ষী-মিথ্যা কথা।" হযরত আবু বকর (রাযি.) বলেন, "রাসূল

www.pathagar.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। কিন্তু যখন মিথ্যা সাক্ষীর প্রসঙ্গ আসল তখন তিনি একেবারে সোজা হয়ে বসে গেলেন এবং মিথ্যা সাক্ষী কথাটা বারবার বলছিলেন। এমনকি আমরা মনে মনে আর না বলার কামনা করছিলাম।" (বোখারী ও মুসলিম)

এমন ভীতি প্রদর্শন ভোটের এই ত্রুটিপূর্ণ প্রয়োগ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রেই কেবল প্রযোজ্য। যা শুধু বংশ ও জাতিগত কারণে হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, অর্থের বিনিময়ে ভোট দিলে দুটি কবিরাহ্ গুনাহ্ হবে। প্রথমত মিথ্যা সাক্ষ্য, দ্বিতীয়ত ঘুষ গ্রহণ।

অতএব, ভোট প্রদানকে শুধুমাত্র দুনিয়াবী ব্যাপার ভাবা এবং দীন তথা ইসলামের সাথে কোন সম্পর্ক নেই এই ধারণা পোষণ করা ঠিক হবে না। প্রত্যেককেই বিশ্বাস করতে হবে যে, পরকালে আল্লাহর সামনে সবাইকে দাঁড়াতে হবে এবং নিজের অন্যান্য কৃতকর্মের সাথে এ কাজেরও হিসাব বা জওয়াব দিতে হবে। তুমি তোমার 'শাহাদাত' বা 'সাক্ষ্য' প্রদানে কতটুকু দিয়ানতদারী বা সততা বজায় রেখেছ! কেউ কেউ মনে করতে পারে যে, অযোগ্য প্রার্থীকে ভোট দেয়া যদি গুনাহ হয় তবে আমরা কি একেবারে পূত-পবিত্র? সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত অগণিত গুনাহেই তো আমরা সারাক্ষণ লিপ্ত। নিজেদের দীর্ঘ পাপের সারিতে এই একটা বাড়লে তাতে আর তেমন কি সমস্যা? তাই সঠিকভাবে অনুধাবনের প্রয়োজন যে, এটা প্রবৃত্তি ও শয়তানের সব থেকে বড় প্রতারণা।

প্রথমত মানুষ যদি কোন অন্যায়-পাপ করতে যেয়ে এ ধারণা পোষণ করে তাহলে কখনো সে কোন পাপ থেকে বেঁচে থাকতে পারবে না। কারণ, কোন ব্যক্তি যদি ছোট-খাট কোন অন্যায়-অপরাধে লিপ্ত হয়ে যায় তাহলে তৎক্ষণাৎ তা থেকে দূরত্ব ও পবিত্রতা অর্জনের চিন্তা করতে হবে। নচেৎ তাকে পাপের অতল গহ্বরে ডুবে যেতে হবে।

দ্বিতীয়ত প্রকারভেদে পাপে পাপে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। যেমন– এমন কিছু পাপ আছে যেগুলির প্রতিক্রিয়া-প্রতিফল সমগ্র জাতিকে ভোগতে হয়। এসব পাপ প্রাইভেট বা ব্যক্তিগত পাপের তুলনায় অধিক মারাত্মক। ব্যক্তিগত

www.pathagar.com

পাপ যত বড় বা মারাত্মক হউক না কেন, এর প্রভাব সাধারণত দু'চারজনের বেশী লোকের উপর পড়ে না। ফলে এর ক্ষতিপূরণ ক্ষমতাও সাধারণত সাধ্যের মধ্যে থাকে এবং তা থেকে তওবা ও ইস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনাও সহজ। আর তা ক্ষমা হওয়ার সম্ভাবনাও প্রবল। পক্ষান্তরে যে পাপের প্রতিক্রিয়া বা প্রতিফল ও প্রায়শ্চিত্ত দেশ ও জাতিকে ভোগ করতে হয়, সে পাপের ক্ষতিপূরণ আদায়ের কোন সুযোগ থাকে না। এ যেন ধনুক থেকে তীর বের হওয়ার পর ফেরত না আসার মত।

আর এজন্য এ ধরনের পাপ বা ত্রুটি থেকে তাওবা করলেও অতীতে সংঘটিত পাপের প্রতিফল বা প্রায়শ্চিত্ত থেকে মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই ক্ষীণ এবং এই আশা করাও সুদূর পরাহত। এ হিসেবে চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচারসহ অন্যান্য পাপ থেকে এ পাপ অনেক মারাত্মক। এমন কি একে অন্য কোন পাপের সাথে কিয়াস বা তুলনাও করা যায় না। একথা ঠিক যে, সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত প্রতিদিন আমাদের দ্বারা কুড়ি খানেক পাপ সম্পাদিত হয়ে থাকে। তবে এর মধ্যে বেশীরভাগ এমন সব পাপ যা তওবার সুযোগ হলে, আল্লাহ পাক ক্ষমা করেও দিতে পারেন এবং এর ক্ষতিপূরণও সম্ভব। তাই বলে এর উদ্দেশ্য এই নয় যে, আমরা আমাদের কর্মের সাথে এমন সব পাপের সংযোজন করব যেগুলির ক্ষতিপূরণ আদৌ সম্ভব নয় এবং যা থেকে ক্ষমা লাভ অনেক কঠিন ব্যাপার।

অনেকে আবার মনে করে লক্ষ কোটি ভোটের মধ্যে আমার একটা ভোটের আর তেমন কি গুরুত্ব। ঐ একটা ভোটের অপব্যবহারে দেশ ও জাতির ভবিষ্যতের উপর তেমন আর কি প্রভাব ফেলবে?

ভোট প্রদানের সময় যদি প্রতিটি লোক এটাই ভাবে, তাহলে সমগ্র দেশে একটা ভোটেরও সঠিক ব্যবহার সম্ভব হবে না। আমাদের দেশে ভোট গণনার যে পদ্ধতি প্রচলিত তাতে যে কোন একটি জনবসতির ভোটই দেশ ও জাতির সিদ্ধান্তের রূপকারে পরিণত হতে পারে এবং কোন বেদীন, কুসংস্কার ভাবাপন্ন ইসলাম বিরোধী ও দুষ্কৃতকারী তার প্রতিদ্বন্দ্বী থেকে মাত্র এক ভোট বেশী পেয়ে বিজয়ী হয়ে দেশ ও জাতি পরিচালনায় মারাত্মক প্রভাব বিস্তার

www.pathagar.com

করবে। (শাসনকর্তা হিসাবে পরিগণিত হবে) আবার কখনো কোন মূর্খ বোকা-সোকা লোকের সিদ্ধান্ত (ভোট) এবং সাধারণ মানুষের সামান্য অসাবধানতা, ভুল-ভ্রান্তি ও অবিবেচকতা সমগ্র দেশকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে পারে। তাই প্রচলিত নিয়মানুযায়ী প্রত্যেকটি ভোটই মহামূল্যবান এবং প্রত্যেকেই যথাযথ দায়িত্বশীলতার সাথে ভোটের সঠিক প্রয়োগ করা তার জন্য শরয়ী, নৈতিক ও মহান জাতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য। এখন প্রশ্ন রয়ে গেল, ভোট কাকে দেয়া যেতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তর একেবারে সুস্পষ্ট। ভোট তাকেই প্রদান করতে হবে যার মধ্যে নিম্নবর্ণিত গুণাবলী বা শর্তাবলী পাওয়া যাবে।

(১) আকিদা-বিশ্বাসের দিক থেকে পাকা মুসলমান হতে হবে।

(২) দীনদার হওয়া। কমপক্ষে দীন, দীনের ধারক-বাহক অর্থাৎ আলেম ওলামা, মসজিদ-মাদ্‌রাসা এবং ধর্মীয় রীতিনীতিকে মানসিকভাবে সম্মান ও সমর্থন করা। সর্বোপরি দেশে ইসলামী শাসন বাস্তবায়নের প্রবল ইচ্ছা থাকতে হবে।

(৩) দায়িত্বশীল ও সুবিবেচকতা। বিবেক-বুদ্ধি বিলোপে অনভ্যস্ততা।

(৪) দেশীয় চেতনা এবং ইসলামী জাতীয়তাবাদের ধারক-বাহক হওয়া। সর্বোপরি দেশের অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব ও ঐক্য টিকিয়ে রাখতে কোন প্রকার সমঝোতা বা আপোস না করার আশ্বাস দিতে হবে।

(৫) ভদ্র ও চরিত্রবান হওয়া এবং সত্যিকারেই দেশ ও জাতির সেবার মানসিকতা রাখা।

(৬) প্রকাশ্য পাপাচার এবং শরয়ী নিষিদ্ধ কার্যক্রম ও বস্তুসমূহ থেকে বিরত থাকা।

(৭) সুস্থ চিন্তার অধিকারী হওয়া। রাষ্ট্র ও প্রশাসন সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রাখা।

আপনার নির্বাচনী এলাকায় যে প্রার্থীর মাঝে এসব শর্তাবলী পাওয়া যাবে এবং যে এই মানদণ্ডে সঠিকভাবে উত্তীর্ণ হবে, সে যে দলেরই হোক তার সাথেই সম্পর্ক স্থাপন করুন এবং তাকে ভোট দিয়ে বিজয়ী করার চেষ্টা

www.pathagar.com

করুন। এই মানদণ্ডে যদি কোন প্রার্থীই উত্তীর্ণ হতে না পারে অর্থাৎ এসব শর্তাবলী যদি কোন প্রার্থীর মাঝেই না পাওয়া যায়, তাহলে এসব শর্ত ও গুণাবলীর বেশী কাছাকাছি যে প্রার্থী তাকেই ভোট দিতে হবে। এই মানদণ্ডে বিচার করতে সকল প্রার্থীর অবস্থা যাচাই-বাছাই ও পর্যালোচনা করা প্রত্যেক ভোটারেরই একান্ত কর্তব্য। স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় তার চাল-চলন, কর্মকাণ্ড, রাজনৈতিক ও সামাজিক অতীত, তার চিন্তাধারা, আকীদা-বিশ্বাস ও চেতনা এবং প্রিয়-অপ্রিয় বিষয়াদি, কাদের সাথে তার ঘনিষ্ঠ ও একান্ত সম্পর্ক, কাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও উঠা-বসা– এসব বিষয়াদি যথাযথভাবে অনুসন্ধান ও যাচাই করতে পারলে ইনশাআল্লাহ সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে তেমন কোন সমস্যা হবে না। বরং তা একেবারে সহজ হয়ে যাবে। এছাড়া উপযুক্ত জ্ঞানী, চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের সাথে পরামর্শ করা যেতে পারে। তার চেয়ে সহজ পদ্ধতি হল আল্লাহ পাকের নিকট সঠিক দিক নির্দেশনা চাওয়া। যার উত্তম পদ্ধতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নির্দেশিত এস্তেখারার পদ্ধতি। নির্বাচনের পূর্বে যে কোন দিন এস্তেখারার নিয়তে দুই রাকাত নামায পড়ে, এস্তেখারার নির্দিষ্ট দুআ পাঠ করবে। দুআ না জানলে নিজের মাতৃভাষাতে বলবে, হে আল্লাহ! ভোটের এ আমানত সঠিকভাবে আদায় করার তওফিক দাও। অনুসন্ধান বা যাচাই, পরামর্শ এবং এস্তেখারার এই তিনটি জিনিস আপনাকে ভোটের মহান আমানত ও দায়-দায়িত্ব থেকে সহজেই মুক্তি বা পরিত্রাণ দিতে পারে। এত কিছুর পর যে ভোট নেক নিয়তে দেয়া হবে ইনশাআল্লাহ তা দেশ ও জাতির শান্তি, উন্নতি, মুক্তি ও সংস্কারে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। তার চেয়েও বড় কথা হল পরকালে জবাব দেওয়া থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

www.pathagar.com

ইসলামের দৃষ্টিতে ভোটের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

সরকারের সমালোচনা করা যে কোন সভ্য দেশেই স্বীকৃত নাগরিক অধিকার। প্রত্যেক অধিবাসীর জন্যই সমভাবে প্রযোজ্য এবং এর প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতাও অনস্বীকার্য। কিন্তু মুসলিম দেশগুলোতে এর ভুল ব্যবহার হয়ে আসছে। এ অধিকার প্রয়োগে আমরা নিজেদের দুর্বলতা ঢাকার চেষ্টা করছি। অথচ একথা একবারও ভাবছি না যে, সরকার আমাদেরই কৃতকর্মের ফল ও আয়নাস্বরূপ। দেশের যাবতীয় দায়-দায়িত্বের সাথে জনগণও সম্পৃক্ত। নির্বাচনের সময় যদি জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে হউক অযোগ্য প্রার্থী বিজয়ী হয়, তাহলে এর সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব জনগণের এবং পরবর্তীতে শাসকদের যাবতীয় ভাল-মন্দের ভাগীদার তারাই হবে, যারা তাদের ক্ষমতাসীন করেছে।

অর্থের বিনিময়ে ভোট ক্রয়ের মাধ্যমে নির্বাচনে বিজয়ী হওয়া নিঃসন্দেহে একটি নিন্দনীয় ও গর্হিত কাজ। তবে এ অপরাধে ঐসব জনগণও সমান অংশীদার যারা অর্থের লোভে দেশ, জাতি, দীন-ধর্ম ও চরিত্রকে ভুলে যায়। পরবর্তীতে যখন তাদের ভোট ক্রেতারা ক্ষমতার রাজ-সিংহাসনে বসে জনগণের রক্ত চুষতে শুরু করে, তখন তারা নিজেরা লজ্জিত হওয়ার পরিবর্তে শাসকদের সমালোচনা করে অর্থ আয়ের নতুন উৎস খোঁজা শুরু করে।

নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে শাসকগোষ্ঠী যদি দেশে ইসলাম বিরোধী ও ধর্মহীন শাসন কায়েম করে, দরিদ্র জনগণের অধিকার লুণ্ঠন করে এবং দেশ ও জাতির রক্ত চুষে, তাহলে বহির্বিশ্বে ঐ কথাই প্রমাণিত হবে যে, ঐ দেশ ও জাতির অধিকাংশ জনগণ এমন কিছুই চায় এবং এটাই তাদের জাতীয় ও সামাজিক চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য এবং সামগ্রিকভাবে তারা আত্মমর্যাদাবোধ ও ভাল কিছু করার জেদী মানসিকতামুক্ত। কিন্তু জনগণ যদি খুব ভেবে-চিন্তে নির্বাচনে তাদের দায়িত্ব পালন করে এবং ধর্মীয় দিক থেকে পুরোপুরি বিবেচনা করে আমানতদারীর সাথে নিজেদের ভোটের ব্যবহার করে সমগ্র

www.pathagar.com

বিশ্ববাসীকে আশ্বস্ত করতে পারে যে, আমরা সত্যিই একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার ধারক-বাহক। পৃথিবীর কোন শক্তিই আমাদেরকে আমাদের দীন থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারবে না। পৃথিবীর সমস্ত পরাশক্তি মিলে আমাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য, ইজ্জত-সম্মান ও স্বাধীনতার ন্যূনতম ক্ষতি করতে পারবে না। সাথে সাথে এও বাস্তবে প্রমাণ করে বিশ্ববাসীকে দেখাতে হবে যে, পার্থিব কোন বিপর্যয়ের আশংকা বা লোভ-লালসা আমাদেরকে আমাদের এই মনোবাসনা বিরোধী কোন কর্মকাণ্ডে উদ্বুদ্ধ করতে পারবে না।

গণতান্ত্রিক রাজনীতির কারণে 'নির্বাচন' ও 'ভোট' শব্দ দুটি এত বদনামী হয়েছে যে, এগুলিকে ধোঁকা, প্রতারণা, মিথ্যা ও ঘুষের সমার্থক মনে করা হয়। ফলে অধিকাংশ সৎ ও সম্ভ্রান্ত লোকজন নির্বাচন এড়িয়ে চলাকেই উপযুক্ত মনে করেন। ফলে এমন ভুল ধারণা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়ে আছে যে, নির্বাচন ও ভোটের রাজনীতির সাথে দীন ও ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। এ ব্যাপারে আরও অনেক অনেক ভুল ধারণা রয়েছে, যেগুলোর অপসারণ একান্তভাবে প্রয়োজন।

প্রথমত ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়েছে সরল প্রকৃতির লোকজনের স্বভাবজাত ভদ্রতা থেকে। এতে তাদের মন্দ কোন ইচ্ছা নেই বটে। তবে ফলাফল বেশ খারাপ। বর্তমানে রাজনীতির অপর নাম ধোঁকা ও প্রতারণা হওয়ায় সম্ভ্রান্ত লোকজন রাজনীতিতে আসছেন না। নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন না এবং তারা নির্বাচনী দাঙ্গা ও কলহে পড়তে চায় না। এ ভুল ধারণা যত ভাল মনে করেই হউক না কেন, তা দেশ ও জাতির জন্যে মারাত্মক ক্ষতিকর। রাজনীতিটা মূলত স্বার্থান্বেষী মহলের হস্তগত হয়ে একটা নোংরা বিষয়ে পরিণত হয়েছে। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত সৎ, যোগ্য, পূত, শুভ্র ও ভাল লোকজন এটাকে পূত-পবিত্র করতে এগিয়ে না আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে নোংরামী বৃদ্ধিই পেতে থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত একদিন এই নোংরামী তাদের ঘরেও অনুপ্রবেশ করবে। সুতরাং দূরে থেকে রাজনীতিকে নোংরা বলে ঘৃণা করা কোন বুদ্ধিমান ও ভদ্রলোকের কাজ নয়। বরং যারা সর্বদা রাজনৈতিক অঙ্গনকে নোংরা করছে ওদের কাছ থেকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছিনিয়ে নেয়াটাই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ। নির্বাচন যে কোন দেশের বৈপ্লবিক টার্নিং

www.pathagar.com

পয়েন্ট। যাতে দেশ ও জাতির ভাগ্যের সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে। প্রতিটি মুসলিম দেশেই কিন্তু ইসলামপন্থী ও ধর্মহীনতাবাদীর (ধর্মনিরপেক্ষবাদী) মধ্যে মূলত নির্বাচনী লড়াই হয়ে থাকে। সুতরাং কোন সচেতন লোকের পক্ষেই এ ব্যাপারে অমনোযোগী থাকার কোন সুযোগ নেই। বরং প্রত্যেক মুসলমানের ফরয বা কর্তব্য হল, তার যাবতীয় চেষ্টা ও সামর্থ ইসলামপন্থীদের সাহায্যে ব্যয় করা। যেমন– হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

الناس اذا رئوا الظالم فلم يأخذوا على يديه اوشك آن يعمهم الله بعقاب

অর্থ: "লোকজন যদি জালেমকে দেখার পর তাকে বাধা না দেয়, তাহলে আল্লাহ্ পাক এদের সবাইর উপর ব্যাপকভাবে শাস্তি অবতীর্ণ করা দূরের কিছু নয়।" (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

আপনি যদি দেখেন যে, দেশে অন্যায়, অনিয়ম হচ্ছে এবং আপনার মত লোক নির্বাচনে অংশ নিয়ে সেসব অন্যায় ও অনিয়ম কিছু হলেও কমিয়ে আনার সুযোগ আছে, তাহলে এই হাদীসের আলোকে আপনার ফরয বা দায়িত্ব হচ্ছে, নীরব বসে না থেকে যথাসম্ভব জালেমকে বাধা দেয়া। অনেক দীনদার লোক মনে করেন, আমি একজনের ভোট না দিলে আর তেমন কি ক্ষতি হবে? এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বক্তব্য শুনুন! হযরত সাহল ইবনে হানীফ (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

من اذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره اذله الله على رؤس الخلائق –

অর্থ: "কোন ব্যক্তি যদি তার সামনে কোন মুমিনকে অপদস্ত করতে দেখে এবং তার সামর্থ থাকা সত্ত্বেও সেই লোককে সাহায্য না করে, তাহলে আল্লাহ্ পাক সমগ্র সৃষ্টি জীবের সামনে তাকে অপদস্ত করবেন।"

(ইযা, পৃ: ১৫, খণ্ড-২)

www.pathagar.com

শরীয়তের দৃষ্টিতে ভোটের অবস্থা হচ্ছে সাক্ষির মত। মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া যেমন হারাম, তেমনি প্রয়োজন মুহূর্তে সাক্ষ্য গোপন করাও হারাম। পবিত্র কোরআনে এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হচ্ছে–

ولاتكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبله –

অর্থ: "আর তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না, যে সাক্ষ্য গোপন করবে তার অন্তর পাপী।" (সূরা বাকারা, আয়াত-২৮৩)

হাদীস শরীফে এ প্রসঙ্গে হযরত আবু মুসা আশআরী (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলে কারীম (সা.) ইরশাদ করেন–

من كتم شهادة اذا دعى اليها كان كمن شهد بالزور –

অর্থ: "কাউকে কখনো যদি সাক্ষ্য দেয়ার জন্য ডাকা হয়, আর সে তখন তা গোপন করে, তাহলে সে যেন মিথ্যা সাক্ষী প্রদানকারীর মত।"

(জামউল ফাওয়ায়েদ, তিবরানীর উদ্বৃতি খণ্ড-১, পৃ: ৬২)

সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে বরং ইসলামের নীতি হচ্ছে, চাওয়ার পূর্বেই এ দায়িত্ব পালন করা। কারও আহ্বান বা উৎসাহের অপেক্ষা করবে না। এ প্রসঙ্গে হযরত যাইদ ইবনে খালেদ (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

الا اخبر كم بخير الشهداء الذى ياتى بشهادته قبل ان يسألها –

অর্থ: "কারা উত্তম সাক্ষী আমি কি তোমাদেরকে বলব না? সেই উত্তম সাক্ষী যে চাওয়ার পূর্বেই সাক্ষ্য দিয়ে দেয়।" (মুআত্তা মালেক ও মুসলিম)

ভোট নিঃসন্দেহে একটি সাক্ষি। তাই এর উপরও কোরআন ও হাদীসের যাবতীয় আহ্কাম প্রয়োগ হবে। ভোট না দেয়া কোন দীনদারী কাজ নয়; বরং এর সঠিক ব্যবহারই প্রতিটি মুসলমানের অপরিহার্য কর্তব্য। উল্লেখ্য, ধার্মিক, সম্ভ্রান্ত, নিরপেক্ষ ও সৎ লোকজন নির্বাচনী যাবতীয় কর্মকাণ্ড থেকে সম্পূর্ণভাবে নির্লিপ্ত থাকার অর্থ হচ্ছে এই মাঠ পুরোপুরিভাবে

www.pathagar.com

বেদীন-অধার্মিক, দাঙ্গাবাজ, অসৎ ও মন্দ লোকজনের হাতে সোপর্দ করে দেয়া। আর এ অবস্থায় হুকুমাত বা রাষ্ট্রযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ কখনও নেক-সৎ, যোগ্য ও সম্ভ্রান্ত লোকদের আয়ত্তে আসা সম্ভব নয়। দীনদার-ধার্মিক লোকজন যদি রাজনীতি থেকে এতই দূরত্ব বজায় রাখে, তাহলে রাষ্ট্রের প্রতি ধর্ম, নীতি ও আদর্শ বিনাশের অভিযোগ করার অধিকারও তাদের থাকতে পারে না। কারণ এর দায়-দায়িত্ব তার নিজের এবং শাসকদের যাবতীয় অন্যায়-অপরাধ, পাপ ও শাস্তি তাদের উপরও প্রযোজ্য। এমনকি সে তাঁর ভবিষ্যত প্রজন্মকেও এই নোংরামী ও অন্যায় থেকে নিরাপদ রাখতে পারবে না। কারণ সে তাদেরকে বাঁচানোর জন্য কোন চেষ্টাই করেনি।

নির্বাচনের ব্যাপারে দ্বিতীয় ভুল ধারণাটি প্রথমটি থেকেও মারাত্মক ক্ষতিকর। মানুষ দীনকে শুধুমাত্র নামায ও রোযার মধ্যেই সীমিত করে নিয়েছে। পক্ষান্তরে রাজনীতি ও সমাজনীতির সবকিছুকেই ধর্ম থেকে পৃথক মনে করে এবং এসব ব্যাপারকে সম্পূর্ণভাবে ধর্মীয় আওতামুক্ত রাখে। ফলে এমন বহু লোকজনকে দেখা যায়, যারা ব্যক্তিগত জীবনে নামায, রোযা, অযীফা এমনকি দরূদেরও নিয়মতান্ত্রিক পাবন্দি করে চলে। অথচ ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেনদেনে হালাল-হারামের কোন চিন্তা নেই। বিবাহ, তালাক ও আত্মীয়তার ক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি কোন আনুগত্য নেই। তারা নির্বাচনকে কেবলই দুনিয়াবী বা পার্থিব কাজ মনে করে একে মনে-প্রাণে ঘৃণা করে। অথচ সে নিজে যে এর থেকেও মারাত্মক বড় অপরাধ ও পাপের সাথে জড়িত তা কিন্তু অনুধাবন করছে না।

অন্যদিকে এমন কিছু লোক আছে, যারা সততার পরিবর্তে শুধু বংশীয় সম্পর্কের কারণে কোন অযোগ্য প্রার্থীকে ভোট দিয়ে দিচ্ছে। অথচ ঐ প্রার্থী যে যোগ্য নয় বা তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অধিকতর যোগ্য তা সে ভাল করেই জানে। তবুও বন্ধুত্বের কারণে বা বংশীয় সম্পর্কের দরুন বা বাহ্যিক কোন লোভ-লালসা ও স্বার্থে প্রভাবিত হয়ে ভোটের অপব্যবহার করছে। সে যে ধর্ম ও শরীয়তের দৃষ্টিতে মারাত্মক অন্যায় করেছে এর কোন অনুভূতিই নেই। যেমন– একটু পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, ভোট একটি সাক্ষি। যে প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

www.pathagar.com

واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذاقربى

অর্থ: "যখন তোমরা কোন কথা বলবে, ন্যায় ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখবে। যদিও সে (যার বিপক্ষে যাবে) তোমাদের নিকটাত্মীয় হয়।"

(সূরা আন-আম, আয়াত-১৫৩)

কোন প্রার্থী যখন বিবেক ও সততার বিবেচনায় ভোটের অযোগ্য সাব্যস্ত হবে বা তার প্রতিদ্বন্দ্বী অন্যকোন প্রার্থী অধিকতর যোগ্য মনে হয়, তখন শুধু জাতিগত দলীয় সম্পর্কের ভিত্তিতে তাকে ভোট দেয়া 'মিথ্যা সাক্ষী'র আওতায় পড়বে। পবিত্র কোরআনে মিথ্যা সাক্ষীর কঠোর নিন্দা জানিয়ে মূর্তিপূজার সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে–

فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور

অর্থ: "তোমরা মূর্তির অপবিত্রতা ও মিথ্যা কথা থেকে বেঁচে থাক।"

(সূরা হজ্ব, আয়াত-৩০)

এ ছাড়া হাদীস শরীফেও রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মিথ্যা সাক্ষ্যকে কবিরা গুনাহসমূহের অন্যতম সাব্যস্ত করেছেন। কঠোর শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করেছেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন বলেন–

"আমি কি তোমাদেরকে মারাত্মক কবিরা গুনাহসমূহ জানিয়ে দেব না? আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া, ভাল করে শুন! 'মিথ্যা সাক্ষি' মিথ্যা কথা! হযরত আবু বকর (রাযি.) বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সময় হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। কিন্তু 'মিথ্যা সাক্ষী' কথাটি বলার সময় সোজা হয়ে বসলেন এবং বার বার বলতে লাগলেন। এমনকি আমরা মনে মনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর থেমে যাওয়া কামনা করছিলাম।" (বোখারী ও মুসলিম)

এ ভয়ঙ্কর ভীতি ভোটের অপব্যবহারকারীদের ক্ষেত্রেই কেবল প্রযোজ্য। যা কেবল জাতিগত ও দলীয় সম্পর্কের কারণে দেয়া হয়েছে এবং অর্থের

www.pathagar.com

বিনিময়ে কোন অযোগ্য প্রার্থীকে ভোট দিয়ে মিথ্যা সাক্ষীর সাথে ঘুষের মত মারাত্মক অপরাধও জড়িত করা হয়। তাই ভোট প্রদানকে শুধু পার্থিব বিষয় এবং দীন-ধর্মের সাথে সম্পর্কহীন মনে করা ঠিক নয়। বিশ্বাস করতে হবে যে, প্রত্যেককেই পৃথক পৃথকভাবে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে হবে এবং অন্যান্য আমলের সাথে এ আমলেরও জবাব দিতে হবে যে, সে তার সাক্ষ্যের ব্যাপারে কতটুকু সততা বজায় রাখল।

অনেকে আবার মনে করে, অযোগ্য পাত্রে ভোট দেয়া যদি পাপই হয়, তাহলে আমরা কি আর তেমন পূত-পবিত্র। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমরা অসংখ্য অপরাধ ও পাপে জড়িত হচ্ছি। পাপের দীর্ঘ এ তালিকায় নতুন একটি পাপ সংযোজিত হওয়া তেমন অসুবিধা কিসের?

প্রবৃত্তি ও শয়তানের সবচেয়ে বড় প্রতারণা হচ্ছে এই ধ্যান-ধারণা। প্রথমত কোন ব্যক্তি যদি প্রতিটি অন্যায় ও পাপের সময় এ ধারণা পোষণ করে তাহলে সে কখনও কোন পাপ থেকে বেঁচে থাকতে পারবে না। কারণ সামান্য একটু ময়লা আবর্জনা লাগলে সাথে সাথে তা পরিস্কার করা প্রয়োজন মনে করে– না কি সে আবর্জনার পুকুরে ঝাঁপ দেয়?

দ্বিতীয়ত পাপের প্রকারভেদে বিরাট পার্থক্য আছে। যে সব অপরাধ ও পাপের ফলাফল সমগ্র জাতি ও দেশকে ভোগ করতে হয় সেসব পাপ ব্যক্তিগত পাপের তুলনায় অনেক মারাত্মক। ব্যক্তি পর্যায়ের পাপ যত বড় ও মারাত্মকই হউক না কেন দু-চার জনের বেশী লোকের উপর এর প্রভাব পড়ে না। তাই এর প্রায়শ্চিত্ত এবং ক্ষতিপূরণও সাধারণত সাধ্যের আওতায়। যা থেকে সহজেই তওবা ও ইস্তেগফার করা সম্ভব এবং সর্বদাই যা ক্ষমার যোগ্য বলে আশা করা যায়। পক্ষান্তরে যেসব পাপের ফলাফল সমগ্র জাতিকে ভোগ করতে হয়, সে সবের প্রায়শ্চিত্তের কোন সুযোগ নেই। এ যেন তীর ধনুক থেকে বের হলে আর ফেরানোর মত নয়। এক্ষেত্রে কেউ যদি ভবিষ্যতের জন্য তওবাও করে, তবুও অতীত পাপের দায়িত্ব মুক্ত হওয়া যথেষ্ট দুষ্কর এবং এর শাস্তি থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার আশাও অনেক কম।

উল্লিখিত দৃষ্টিভঙ্গিতে এ পাপ চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানী ও ব্যভিচারসহ অন্যান্য পাপ থেকে অনেক মারাত্মক এবং একে অন্যান্য পাপের

www.pathagar.com

সাথে তুলনা করাও ঠিক নয়। হ্যাঁ, একথা ঠিক– সকাল-বিকাল আমরা অনেক পাপই করছি, তবে আল্লাহ্ পাক তওবার সুযোগ দিলে এসব ক্ষমাও হতে পারে। এসবের প্রায়শ্চিত্তেরও সুযোগ আছে। তবে এর অর্থ এই নয় যে, আমরা এমন পাপেও জড়িয়ে যাব যার প্রায়শ্চিত্ত অসম্ভব এবং ক্ষমা পাওয়া যথেষ্ট দুরূহ।

অনেকে আবার এ-ও মনে করে, লক্ষ লক্ষ ভোটের মধ্যে আমার একটা ভোটের আর তেমন কি গুরুত্ব? কিন্তু এর অপব্যবহার হলে দেশ ও জাতির ভবিষ্যতের উপর কত মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে, তা কি কল্পনা করা যায়? লক্ষ্যণীয় যে, সবাই যদি এমন ভাবে তাহলে সমগ্র দেশে একটা ভোটেরও যে সঠিক ও যথাযথ ব্যবহার হবে না। এছাড়া আমাদের দেশে প্রচলিত নির্বাচনী পদ্ধতিতে একজন নিরক্ষর ও মূর্খ লোকের ভোটই দেশ ও জাতির ভাগ্য নির্ণয়কারী হতে পারে। যে কোন ধর্মদ্রোহী, অর্বাচীন ও অপরাধী মাত্র এক ভোটের ব্যবধানেও বিজয়ী হয়ে দেশ ও জাতির নিয়ন্ত্রক হয়ে যেতে পারে এবং মাত্র একজন মূর্খ ও অসচেতন লোকের সামান্য অবহেলার দরুন গোটা দেশ ও জাতি ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। তাই প্রচলিত নির্বাচনী ব্যবস্থায় প্রত্যেকটি ভোটই মহামূল্যবান এবং নৈতিক ও জাতীয় দায়িত্ববোধের সাথে সঠিকভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা প্রত্যেকের দীনী ও শরয়ী কর্তব্য।

www.pathagar.com

ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থা

নোংরা রাজনীতি হিসেবে পরিচিত বস্তুবাদী রাজনীতির প্রতি আমাদের ন্যূনতম কোন আগ্রহ নেই। তবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রকে যারা শুধুমাত্র দীনের পতাকা উত্তলনের জন্যে নির্বাচিত করেছে বক্ষ্যমাণ আলোচনা কেবল তাদের প্রসঙ্গে। পক্ষান্তরে যারা বস্তুবাধী ও ভোগবাদী রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত তারা এ আলোচনা বহির্ভূত। বস্তুত রাজনৈতিক অঙ্গনে ইসলামী রাজনীতির অস্তিত্ব অতীব প্রয়োজনীয় এবং সৌভাগ্যের বিষয়। কারণ রাজনৈতিক দূরাবস্থার মধ্যেও কেবল এদের মাধ্যমেই দীনের আওয়াজ জিইয়ে আছে। পৃথিবীতে এমন অনেক দেশ আছে যেগুলোকে ইসলামী রাষ্ট্র বলে আখ্যায়িত করার পরও সেখানে ইসলামী রাজনীতি বলতে কোন কিছু পরিলক্ষিত হয় না। আনন্দের কথা, আমাদের দেশের ইসলামী দলগুলো এখন পর্যন্ত ধর্মহীন রাজনীতি প্রতিরোধে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আর তাদের এসব তৎপরতার দরুন ইসলামের শত্রুরাও একেবারে ফাঁকা মাঠের সুযোগ পাচ্ছে না।

এসব প্রশংসনীয় বিষয়াদির পরও তাদের কিছু কিছু কার্যক্রমে প্রশ্ন ও অভিযোগ সৃষ্টি করছে। যা মারাত্মক ভয়ঙ্কর ধরনের এবং ফলাফলের দিক দিয়েও যথেষ্ট ক্ষতিকর। বক্ষ্যমাণ আলোচনায় এসব ত্রুটি ও দুর্বলতার পর্দা উন্মোচন করা হবে। আশা করি সম্মানিত পাঠক মহল সুস্থ মন-মানসিকতা নিয়ে বিষয়টির প্রতি লক্ষ করবেন।

ইসলামী নামের কারণে এদের ব্যাপারে সাধারণ জনগণ অনেক আশাবাদী ছিল। কিন্তু গত কয়েক বছর যাবত ইসলামী দলগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক এবং কর্মসূচী জাতিকে সম্পূর্ণভাবে নিরাশ করেছে। দেশের স্বাধীনতা ও ভৌগোলিক অস্তিত্ব যখন হুমকির সম্মুখীন এবং দেশে ইসলাম থাকা না থাকার প্রশ্ন সমগ্র জাতি তখন ইসলামী দলগুলোর উপর এই বলে আস্থাশীল ছিল যে, তারা কমপক্ষে অঞ্চল, গোত্র ও দল প্রীতির উর্ধ্বে থাকবে এবং দেশ

www.pathagar.com

ও জাতির বৃহৎ স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে অভিন্ন বিষয়াদি হাসিলে কোন বাধা সৃষ্টি করবে না। সর্বোপরি ঐক্য কায়েমে সচেষ্ট হবে।

দুঃখের বিষয়, ইসলামী দলগুলো জাতির এ প্রত্যাশার কোন মূল্যায়ন করেনি; বরং তারা জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মনের আকুতিকে নির্মমভাবে পদদলিত করেছে। সার্বিক ঐক্য তো দূরের কথা, বিচ্ছিন্নভাবে যে সমঝোতা হয় তাও যদি হত তবুও ভাল ছিল। এই দাগ এখনও মুছেনি, আবার মান-সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দেয়া হল। পারস্পরিক দ্বন্দ্ব এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেল যে, গাল-মন্দ, ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও তিরস্কারের ধূয়ায় সবকিছু আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে।

প্রত্যেক দলই এ দূরাবস্থার জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে অভিযুক্ত করে। অথচ এ দুঃখজনক ভুল থেকে কোন দলই মুক্ত নয়। ইসলামী দলগুলোর মতবিরোধ যে পদ্ধতি অবলম্বন করে চলছে তাতে ভদ্রতা ও শিষ্টতার ন্যূনতম লক্ষ্যণও নেই এবং সময়ের গুরুত্বপূর্ণ দীনের চাহিদা ও দাবীকে তারা মারাত্মকভাবে ব্যাহত করছে। কারও সাথে একটু ভাল সম্পর্ক হলে তার প্রশংসার স্তুতি পড়ে যায়। পরক্ষণেই একটু বিরোধ দেখা দিলে এমনভাবে তার মন্দ বলা শুরু করবে যেন তার মধ্যে কোন ধরনের ভাল গুণই নেই। আর অতীতে তার সাথে বন্ধুত্ব থাকাকালীন সময়ের ভাল গুণেরও কোন মূল্যায়ন করবে না। এমনকি তাকে তার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও পূর্বসূরীদেরকেও এমনভাবে সমালোচনার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে যেখানে ভদ্রতা ও শালীনতার ন্যূনতম কোন স্থান থাকে না।

কোথাও যদি মতানৈক্যের শাস্তির কোন বিধান না থাকে তাহলে সেখানে পরস্পর কাদা ছোঁড়া ছুড়ি এবং সমালোচনা করা খুবই সহজ। যেখানে ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে পত্রিকায় বিবৃতির লড়াই সার্বক্ষণিক লেগেই আছে, সেখানে বড় ধরনের কোন ঐক্য কি করে হতে পারে? আর যদি ঐক্য হয়ও তবে তা ক'দিনই বা টিকবে?

বিভিন্ন চিন্তার লোকজনকে অভিন্ন কোন বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ করা বেশ কঠিন ব্যাপার, এটা অনস্বীকার্য। তবে এটাও ঠিক, বিষয়টা এত জটিল ছিল না যতটা তারা বানিয়েছে– যার অনিবার্য ফলশ্রুতিতে জনগণের আস্থা হারাতে হয়েছে।

www.pathagar.com

সরলমনা সাধারণ জনগণ কিন্তু মতানৈক্যের সূক্ষ্ম বিষয়াদি বুঝে না এবং ঐক্যের সমস্যাবলী সম্পর্কেও তারা জ্ঞাত নয়। সর্বোপরি তারা এসব যথাযথভাবে বুঝারও অবকাশ রাখে না। তারা যখন দেখে, ইসলামের নামে পরস্পর বিরোধে লিপ্ত, তখন সহজভাবেই ধরে নেয় ব্যক্তি, আর্থিক ও পার্থিব কোন স্বার্থেই এসব হচ্ছে। ফলে সে ইসলাম থেকেই আগ্রহটা হারিয়ে ফেলে। পরিবর্তন করে ফেলে তার মনের গতিকে। এ পরিবর্তন নিঃসন্দেহে ভুল। কোন ভূ-সম্পত্তি নিয়ে যদি মালিক পক্ষ পরস্পরে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে তাহলে এর উদ্দেশ্য এই নয় যে, ঐ জায়গা ডাকাত শ্রেণীর মত তৃতীয় কোন পক্ষের কাছে সমর্পণ করে দিতে হবে। তবে মালিক পক্ষকে বুঝতে হবে, পারস্পরিক বিবাদে কারা সুযোগ নিতে যাচ্ছে।

পারস্পরিক বিবাদ ছাড়াও ইসলামী দলগুলোর ব্যাপারে উল্লেখ করার মত আরও বেশ কিছু অভিযোগ আমাদের কাছে আছে। এসব অসমীচীন মনে হয়। আমার মতে সবকিছুর কারণ হচ্ছে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিজেদের অবস্থান নির্ণয় করতে না পারা। শত ব্যস্ততা ও ঝামেলার মধ্যেও আমাদেরকে ভুলে গেলে চলবে না, আমাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য দীন। রাজনীতিতে পড়ে তাই শুরু থেকেই ইসলামী দলগুলো এমনভাবে চলার প্রয়োজন যেন তাদের মধ্যে দীনের প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে।

সাধারণ রাজনৈতিক দলগুলোর মূল লক্ষ্য ও চিন্তা হচ্ছে ক্ষমতা। তাই তারা ব্যক্তি সংশোধনের কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। কিন্তু ইসলামী রাজনীতির যাবতীয় ভিত্তি ব্যক্তিসত্তার উপর নির্ভর করে। তাই এ জন্যে সর্বপ্রথম ব্যক্তি সংশোধন প্রয়োজন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সংক্ষিপ্ত তেইশ বছরের তের বছর মক্কায় শুধুমাত্র ব্যক্তি সংশোধনের কাজ করেছেন। দীর্ঘ তের বছর মক্কায় শুধুমাত্র ব্যক্তি সংশোধনের ফলে যে লোকবল সৃষ্টি হয়েছিল, তারাই বদর ও হুনাইনের যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। সমগ্র আরব উপদ্বীপে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করেছেন। অতঃপর পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সত্য ধর্মের বিজয় কেতন উড়িয়েছেন।

www.pathagar.com

আফসোস! ব্যক্তি সংশোধনের প্রতি ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোর কোন পদক্ষেপ নেই। অন্যান্য দলের মত তারাও রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনকেই নিজেদের মূল লক্ষ্যে পরিণত করেছে। এসব খেতাবপ্রাপ্ত দলগুলোর কোন হুঁশই নেই যে, তাদের যাত্রাই হয়েছে দীনের নামে। দেরিতে হলেও তারা ব্যক্তি সংশোধনের কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারে। বস্তুত এক্ষেত্রে তাদের সময় নেয়াটা একেবারেই উচিত নয়। এভাবে যদি একটি সম্মিলিত ঐক্য গড়ে তোলা যায় তবে তা হয়ে উঠবে একটি অপরাজেয় দুর্গ এবং তারা পৃথিবীকে লোহার মত নিজেদের করে নিতে পারবে।

একজন মুসলমানের মূল সম্পদ হচ্ছে আল্লাহভীতি এবং পরকালীন চিন্তা। যতদিন পর্যন্ত এ বিষয়টি তার শিরায় শিরায় অনুপ্রবেশ না করবে ততদিন পর্যন্ত তার রাজনৈতিক কার্যক্রম ও অবস্থান অন্যদের চেয়ে ভিন্নতর হতে পারবে না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রটা এদিক দিয়ে খুবই কন্টকাকীর্ণ। সেখানে প্রবৃত্তি ও শয়তানের কার্যকারিতার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। পদ, খ্যাতি ও মর্যাদার মত বিষয়গুলো প্রতি পদে পদে যে কোন পূত-পবিত্র ব্যক্তিকেও আকর্ষিত করে ফেলে। সুতরাং ইসলামী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রতি যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের আকর্ষণ সৃষ্টি না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মন-মানসিকতা ঐসব পার্থিব বিষয় থেকে মুক্ত হতে পারবে না। এসব বিষয়াদির কল্পনা ও মোহ বা আকর্ষণ যখন জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে তার মন-মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে রাখবে তখন তার মাথায় কেবল যৌক্তিকতা, উপযোগিতা ও মোসলেহাতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের উদ্ভব ঘটবে এবং দীনের মূল দাবী ও উদ্দেশ্য এসব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের তোপে ভেসে যাবে।

এহেন দূরাবস্থা থেকে মুক্ত হবার একমাত্র পথ ও পদ্ধতি হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন এবং তায়াল্লুক মাআল্লাহ্ বা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন। যার অন্তর আধ্যাত্মিক এই উৎকর্ষতায় সমৃদ্ধশালী হবে সে তার প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে আল্লাহ পাকের উপস্থিতি অনুভব করবে এবং তাঁর কাছে সঠিক দিকনির্দেশনার প্রত্যাশা করবে। দৃঢ়তার জন্যে ব্যাকুল থাকবে এবং পুলসিরাতের এই পরীক্ষায় তার সামান্যতম পদস্খলনে জাহান্নামে পতিত

www.pathagar.com

হওয়ার ভয়ে সে সার্বক্ষণিক ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকবে। এই ভীতি ও আশংকায়ই কেবল মানুষের অন্তর থেকে জেদ, আত্মম্ভরিতা, হঠকারিতা ও কথার কৌটিল্যতাকে দূরীভূত করতে পারে। এসবের অস্তিত্বকে বিনাশ করতে পারে। সর্বোপরি এসবের দ্বারা সর্বক্ষণই এই চিন্তা তার খেয়ালে থাকবে যে, সে কেন রাজনৈতিক ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছে!

ইসলামী ইতিহাসের প্রাথমিক যুগের যে রাজনীতিকে আমরা নিজেদের জন্যে আইডিয়েল বা আদর্শ মনে করি, প্রকৃতপক্ষে সে রাজনীতির ভিত্তি কিন্তু এই আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের উপরই ছিল। এখনও যদি আমাদের কোন রাজনৈতিক কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, তবে এর কোন বিকল্প পথ বা পদ্ধতি নেই।

অতএব, ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলির নেতৃবৃন্দের প্রতি আমার একান্ত দাবী, তারা যেন তাদের কর্মসূচীর প্রতি একটু লক্ষ করত ব্যক্তি সংশোধনের কর্মসূচীর প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেন। দলের সদস্যদেরকে কোরআন, হাদীস, সাহাবা, সুলাহা ও বুযুর্গানে দীনের জীবনীসহ অন্যান্য ধর্মীয় বই-পুস্তক পাঠে অনুপ্রাণিত করেন। যার অন্তর আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার যোগ্যতা রাখে, সে যেন বুযুর্গানে দীনের সান্নিধ্য লাভে অভ্যস্ত হয়। আর এজন্যে সম্মিলিত কর্মসূচীতে আমল ও আখলাকের সংশোধনীর নিরীক্ষণ হওয়া এবং আল্লাহর ওলীদের লেখা পড়া প্রয়োজন।

এমন প্রশিক্ষণমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে যাবতীয় মতবিরোধ চিহ্নিত ও মিটানোর সঠিক অভ্যাস সৃষ্টি করতে হবে। অবস্থান নির্ণয়ের অভ্যাস সৃষ্টি করতে হবে। নিজের সমালোচনা ও গাল-মন্দ শুনার মত ধৈর্য, স্থিতিশীলতা এবং সেসব কার্যে পর্যবসিত করতে হবে। অধিকন্তু চরম উত্তেজনার সময়ও দীনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও চাহিদার প্রতি বিশেষ লক্ষ রাখার যোগ্যতা ও নৈপুণ্য অর্জন করতে হবে। এ বিষয়গুলোর প্রতি যদি যথাযথভাবে দৃষ্টি দেয়া হয়, তবে অতীতের অনেক ভুল-ভ্রান্তি থেকে শিক্ষা ও ভবিষ্যত অনিষ্টতা প্রতিরোধ করা যাবে ইনশাআল্লাহ।

www.pathagar.com

মুসলিম জাতীয়তাবাদ ও আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা

পৃথিবীর সকল দেশ ও রাষ্ট্র থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছিল। যার জন্ম হয়েছিল ভারতবর্ষের মুসলমানদের জন্যে পৃথক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে এবং নিজেদের ধর্ম ও সংস্কৃতি অনুযায়ী জীবন পরিচালনার লক্ষ্যে পৃথক আবাসভূমি গড়ার উদ্দেশ্যে। ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এই স্লোগান এমন এক সময় উঠেছিল যখন সমগ্র বিশ্বে আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের (Nationalism) ব্যাপক জোয়ার। বিশ্বব্যাপী এ দাবীর গ্রহণযোগ্যতা আনয়ন ও স্বীকৃতি আদায়ের যেমন সর্বাত্মক চেষ্টার প্রয়োজন ছিল, ঠিক তেমনি এই পৃথক ও স্বাধীন আবাসভূমিটি অর্জন করত এর নির্মাণও এভাবে করা প্রয়োজন ছিল, যেন রাষ্ট্রের প্রতিটি ধূলিকণায় মুসলিম জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ছোঁয়া থাকে।

দুঃখের বিষয় যে, ঈমানী চেতনায় উদ্দীপ্ত লোকজন প্রথম স্তর যথেষ্ট সাফল্যের সাথেই উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় স্তরে এসে তারা ভুলে বসেছে যে, তারা কোথা থেকে যাত্রা শুরু করেছে এবং কেন করেছিল? সর্বোপরি এ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যই বা কি?

মুসলিম জাতীয়তাবাদের ধারণা ও চেতনা শুধু পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন ছিল না; বরং এর স্থায়িত্ব ও উন্নতির জন্যও প্রয়োজন ছিল। সময়ের স্বাভাবিক ধারা যেহেতু আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ কর্তৃক প্রভাবিত। পক্ষান্তরে মুসলিম জাতীয়তাবাদের সাথে একেবারেই অপরিচিত ছিল জাতি। তাই এ দেশ রক্ষায় এমন কিছু বৈপ্লবিক কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন ছিল, যা এ মতবাদকে চিন্তার জগত থেকে বের করে বাস্তব ও কার্যে পর্যবসিত করতে পারত এবং সাধারণ মানুষের মত ও চিন্তা আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের যে ম্যাজিক ও প্রবঞ্চনায় আচ্ছন্ন ছিল, তা অপসারণ করতে পারত। এর জন্য দেশটিতে ইসলামী শাসন কায়েম করা সর্বাধিক প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজন ছিল ইসলামী শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন। মুসলিম মানসিকতার উৎকর্ষ সাধন, আঞ্চলিকতার মূলোৎপাটন, সর্বোপরি রাষ্ট্রের প্রতিটি রগ-রিশায় ইসলামী

www.pathagar.com

ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের অনুপ্রবেশ। মোদ্দাকথা, এই দেশ মুসলিম মিল্লাতের একটি অংশ এবং রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকেরই যে সমান অধিকার ও অংশীদারিত্ব রয়েছে জনগণের মনে এ বিশ্বাস সৃষ্টি করার মত পরিবেশ-পরিস্থিতি সৃষ্টি করা একান্ত প্রয়োজন ছিল।

অপ্রিয় হলেও সত্য, পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে আজ পর্যন্ত উপরোল্লিখিত কার্যক্রমের কিছুই বাস্তবায়িত হয়নি। এর কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে, কোন কোন বিষয়ের গুরুত্ব শাসকগোষ্ঠী আদৌ অনুধাবন করতে পারেনি। অন্যদিকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাতাদের ক্রমান্বয়ে মৃত্যুজনিত কারণেও কিছু বিষয় বাস্তবায়িত হতে পারেনি। ফলে দেশটির শাসনভার এমন লোকজনের হাতে ন্যস্ত হয়, যারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মূলভিত্তি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছুই জানে না।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম জাতীয়তাবাদের ধারণা কেবলই স্লোগানে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং শাসকগোষ্ঠী এর দ্বারা নিজেদের অন্যায় ও দুর্নীতি ধামাচাপা দিতে থাকে। ফলে মতবাদটির প্রয়োজনীয় ও চাহিদার মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে। এদেশ ইসলামের জন্যে একথা কেবল মুখেই বলতে লাগল, বাস্তবে কিন্তু ইসলামের উপযুক্ততা ও যৌক্তিকতা বিনাশ করা হল। সকল মুসলমান এক জাতি বলে দাবি করা হল এবং ঘোষণা করা হল যে, পাঞ্জাবী, বাঙালী, সিন্ধী, পাঠান ও বেলুচী বলে কোন পার্থক্য নেই। অথচ বাস্তবে আঞ্চলিকতার পূজা করা হল। ফলে মুসলিম জাতীয়তাবাদের ধারণা ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে। সাধারণ জনগণের মধ্যে এ ধারণা ও বিশ্বাস জন্ম নিল যে, শাসকগোষ্ঠী প্রতারণার আশ্রয় নিতেই এ মতবাদের শরণাপন্ন হয়েছে। ফলে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের যে জোয়ার ছিল তা ধীরে ধীরে প্রাধান্য বিস্তার করে ব্যাপক গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠে।

পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার পর আমাদের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন এবং অবশিষ্ট রাষ্ট্র সীমানা রক্ষার্থে পাকিস্তান সৃষ্টির পেছনে একমাত্র কার্যকর মতবাদ 'মুসলিম জাতীয়তাবাদী' ধারণার পুনরুজ্জীবনও প্রয়োজন। পরিতাপের বিষয়, পাকিস্তান নেতৃবৃন্দ এখনও ভাবছে যে, এ ধারণা শুধুমাত্র

www.pathagar.com

বক্তৃতা, বিবৃতি, বলা ও লেখার দ্বারাই কেবল পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠবে এবং এ মতবাদ বিরোধী আঞ্চলিক ষড়যন্ত্র কেবল গ্রেফতারীতেই দমন হবে।

আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ একটি বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন। যা অত্যন্ত চতুরতার সাথে জনগণের মন-মানসিকতা জয় করে নিয়েছে এবং এর ব্যাপক প্রসার ঘটাতে বছরের পর বছর ধারাবাহিক তৎপরতা চলে আসছে। প্রয়োজনে নিত্য নতুন বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করছে। যুদ্ধ-বিগ্রহ বাঁধিয়েছে। অধিকন্তু মানুষের মনে এ ক্ষতিকারক চিন্তাধারার বিষাক্ত বীজ বপনে এমন এমন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় যে, নিজেদের অজান্তেই সাধারণ জনগণের চিন্তা-চেতনা এ বিষাক্ত ছোঁয়ায় প্রভাবিত হয়ে পড়ে। আর তখনই প্রকাশ্যে আঞ্চলিক ও ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার প্রচার শুরু করে। এমন ইবলিসি মতবাদ ও আন্দোলন প্রতিরোধ শুধু হাওয়াই বক্তব্য এবং জোর-জবরদস্তিমূলক কার্যক্রমে সম্ভব নয়; বরং এর প্রতিরোধে ঝোঁক ও হুঁশের বিচক্ষণ সংমিশ্রণ প্রয়োজন। এমন বুদ্ধিদীপ্ত কর্মসূচী প্রয়োজন যা আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ প্রতিরোধের সাথে সাথে এর পরিবর্তিত বা বিকল্প (Replace) হিসেবে মুসলিম জাতীয়তাবাদকে একটি বাস্তব ও কার্যকরী মতবাদ হিসেবে তোলে ধরতে পারে। সংবিধান ও শিক্ষা-সংস্কৃতিসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক কর্মসূচীর প্রয়োজন। আর এজন্য নিম্নোল্লিখিত বিষয়াবলী বাস্তবায়ন করা একান্ত প্রয়োজন।

(১) দেশে সত্যিকার অর্থে ইসলাম কায়েম করা।

(২) নিজের মন-মানসিকতাকে ইসলামের হৃদয়গ্রাহী শিক্ষার ধাঁচে সুসজ্জিত করা।

(৩) অন্তরে আল্লাহ ও আখেরাতের ভীতি সৃষ্টি করতে হবে।

(৪) ইসলামের জন্যে জীবন-মরণ উৎসর্গ করার প্রেরণা ও আবেগ সৃষ্টি করতে হবে।

(৫) শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার করে তা থেকে আঞ্চলিকতা ও বিচ্ছিন্নতার বিষাক্ত বিষয়াবলী দূর করতে হবে।

www.pathagar.com

(৬) মিডিয়াকে শুধু চিত্ত-বিনোদনমূলক উপকরণ না বানিয়ে মুসলিম মানসিকতা গঠনে ব্যবহার করতে হবে।

(৭) অন্যায় ও বে-ইনসাফের অবসান করতে হবে।

(৮) অশ্লীলতা ও নগ্নতাসহ যাবতীয় ইসলাম বিরোধী কার্যক্রম বন্ধ করতে হবে।

(৯) প্রতিটি ঘরে ঘরে ইসলামী সংস্কৃতি ও রীতি-নীতি বাস্তবায়ন করতে হবে।

উল্লেখ্য, তথাকথিত জাতীয়তাবাদ খোদাদ্রোহী ও ইসলামবিরোধী প্রচার-প্রপাগান্ডা সব সময়ই করে আসছে। এই বস্তুবাদী জাতীয়তাবাদের নোংরামী থেকে কোন মুসলিম দেশকে মুক্ত ও পবিত্র রাখতে পারলে এবং সেখানে উপরোল্লিখিত বিষয়াদির সঠিক বাস্তবায়ন করলে সে দেশের ঐক্য, স্থায়িত্ব, উন্নতি, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব নিশ্চিত এবং অবশ্যম্ভাবী।

বিশ্বব্যাপী মুসলিম রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রকদের ইচ্ছা ও অনিচ্ছাকৃত কার্যক্রমে মুসলিম জাতীয়তাবাদের ধারণাকে দিনকে দিন দুর্বল করে দিচ্ছে এবং আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতাকে শক্তি যোগাচ্ছে। এমনকি কখনো কখনো তাদের কিছু কিছু কার্যক্রমে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, তারা মুসলিম জাতীয়তাবাদের ধ্যান-ধারণাকে বিনাশ করতেই এসব করছে। জাতীয়তাবাদের পূজক নেতৃবৃন্দের কারণে আজ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটানো হচ্ছে। যেমন– পাকিস্তানে 'শতাব্দীর আয়নায় সিন্ধু' নামে রাষ্ট্রীয়ভাবে যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালন করা হল, এটা কখনো ভাবা যায় যে, এমন এক দেশ বা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে করা হয়েছে যেখানে এমন আরও বেশ কয়েকটি ভিন্ন সভ্যতা ও জাতিগতগোষ্ঠী রয়েছে? কিন্তু এত কিছুর পরও সেই দেশটি সমস্ত আঞ্চলিকতার উর্ধ্বে উঠে এক মিল্লাত ও মুসলিম জাতীয়তাবাদের ধারণা প্রচার করে থাকে।

প্রত্যেক অঞ্চলেই নিজস্ব কিছু চাল-চলন ও সংস্কৃতি রয়েছে। ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক নয় এমন সংস্কৃতি সংরক্ষণে ইসলাম কখনো বাধা দেয় না। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, সেটাকে স্বতন্ত্র একটি জাতির ভিত্তি হিসেবে

www.pathagar.com

উপস্থাপন করা যাবে এবং একে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে দীন ও ধর্মের সম্পর্ক ছিন্ন করে রাজনৈতিক মেরুকরণ করতে হবে। যেমন– পাকিস্তানের অনেক স্থানে মহেঞ্জোদারু, হরপ্পা, তক্ষশীলার মতো অনেক প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়। এসব প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক দিক দিয়ে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ এবং এই দৃষ্টিকোণ থেকে এসব সংরক্ষণে কোন অবহেলার সুযোগ নেই। কিন্তু যখনই এগুলোকে পাকিস্তানের সভ্যতার ও সংস্কৃতির উৎসস্থল মনে করা হবে এবং এগুলোকে স্বীকৃতি দিয়ে গ্রহণযোগ্য করে তোলা হবে, তখন এসব মুসলিম জাতীয়তাবাদের ধারণার জন্য মারাত্মক ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়াবে। দুঃখের বিষয় যে, রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সর্বদাই এগুলিকে ঐতিহাসিক স্মৃতির মর্যাদা দেয়া হচ্ছে এবং তথ্য মাধ্যমসহ জাতীয় পাঠ্যক্রমেও অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। অথচ শাসক শ্রেণী কখনো চিন্তা করল না, এর দ্বারা নতুন প্রজন্মের কি মানসিকতাটাই না সৃষ্টি হচ্ছে। যা মুসলিম জাতীয়তাবাদী ধারণার সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক এবং এর জন্য মারাত্মক ক্ষতিকারক।

www.pathagar.com

দেশপ্রেম ও স্বজনপ্রীতি

পৃথিবীর যে প্রান্তেই যে কোন মানুষের জন্ম হোক না কেন, সে স্থানের সাথে সেই লোকটির বিশেষ সম্পর্ক হওয়াটাই স্বাভাবিক এবং প্রকৃতির বিধি। যেখানে লোকটির জন্ম হল, তার শারীরিক মানসিক প্রবৃদ্ধি অর্জন হল এবং যেখানে তার শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের আনন্দ উচ্ছল সময় অতিবাহিত হল, যে স্থানে প্রথম বৈচিত্রময় জীবন উপভোগের সুযোগ হল তার, সে স্থান ও ভূমির প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ও দুর্বল হওয়াটাই স্বাভাবিক। এক পর্যায়ে সেখানকার মাটি, বসবাসকারী, ভাষা-সংস্কৃতি, অলি-গলি ও হাট-ঘাটকেও সে ভালবাসতে শুরু করে দেবে। জন্মভূমির প্রতি ভালবাসা নেই এমন লোক পৃথিবীতে খুবই বিরল বা নেই বললেই চলে।

জন্মভূমির প্রতি এমন ভালবাসা মন্দ বা খারাপ কিছু নয়, ইসলামও এই প্রাকৃতিক ভালবাসার বিরোধী নয়। যেমন হাদীস শরীফে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে যখন মদীনায় স্থায়ী নিবাস গড়লেন, তখন সফর থেকে মদীনায় ফেরার সময় উহুদ পাহাড় যখনই দেখতেন তিনি বলতেন–

هذا جبل يحبنا ونحبه

অর্থ: "এই সেই পাহাড় যা আমাদেরকে ভালবাসে এবং আমরাও যাকে ভালবাসি।"

এই দেশপ্রেমই যদি যুক্তিগ্রাহ্য সীমা অতিক্রম করে এবং অতিরঞ্জিত স্বদেশপ্রেমের কারণে মাতৃভূমির সবকিছুকেই 'নিজের' মনে করা, পক্ষান্তরে বাইরের সবকিছুকেই 'পরের' মনে করাকে (عصبية) আসাবিয়্যাত বলে। ইসলাম এর ঘোর বিরোধী। ইসলাম স্বাভাবিক স্বদেশপ্রীতিকে বিশেষ মর্যাদা দেয়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, এটাই (দেশপ্রেম) সামাজিক ঐক্যের ভিত্তি হবে। বন্ধুত্ব, শত্রুতা, ভালবাসা ও ঘৃণার মাপকাঠি হবে। এর ভিত্তিতেই উচ্চ ও নিম্নবর্ণে শ্রেণী বিভক্তি ও ন্যায়-অন্যায় সাব্যস্তকরণকে সমর্থন করতে হবে।

www.pathagar.com

যেমন– আপনি দেশের বাইরে কোথাও অবস্থান করছেন। সেখানে নিজ দেশের কোন লোকের সাথে হঠাৎ আপনার পরিচয় হলে স্বাভাবিকভাবেই আপনি বেশ খুশি হবেন। তার সাথে কথা বলতে এবং দেশের খোঁজ-খবর নিতে আপনি যথেষ্ট আগ্রহী হবেন এবং এতে আপনার বেশ ভালও লাগবে। এটা মূলত মাতৃভূমি বা দেশের প্রতি প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক ভালবাসার নিদর্শন ও বহিঃপ্রকাশ। যা ইসলামের দৃষ্টিতে অগ্রহণযোগ্য নয়। পরের দিন দেখা গেল আপনার সেই দেশী লোকটি সেখানকার কোন স্থানীয় লোকের সাথে ঝগড়া-বিবাদে জড়িয়ে গেছে, এমতাবস্থায় আপনি ন্যায়-অন্যায় না দেখে শুধু সে আপনার দেশী বলে তার পক্ষাবলম্বন করাই (عصبية) আসাবিয়্যাত– দেশপ্রীতি বা এলাকা-প্রীতি বা স্বজনপ্রীতি। ইসলাম বিষয়টিকে কোনভাবেই সমর্থন করে না।

রাষ্ট্রের শীর্ষপদে দেশী বা এলাকার কাউকে সমাসীন দেখে ভাল লাগাটা মাতৃভূমির প্রতি প্রাকৃতিক ভালবাসারই ফলশ্রুতি। এতে ইসলামের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের কর্তৃত্ব আপনার এলাকার কারো হাতে না থাকার কারণেই কেবল আপনি যদি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন বা অসহযোগিতা করেন অথবা আপনি শুধু দেশী বলে কাউকে যদি অন্য এলাকার অধিকতর যোগ্য প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও কোন সরকারী পদ বা দায়িত্ব দিতে চান, তাহলে এটা নিছক স্বজনপ্রীতি বা আঞ্চলিকতা হবে, যাকে ইসলাম কোন প্রকার প্রশ্রয় দেয় না।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করছেন:

يايها الناس انا خلقنكم من ذكر وانثى وجعلنكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم –

অর্থ: "হে মানব! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার।" (সূরা হুজুরাত, আয়াত-১৩)

www.pathagar.com

আয়াতটিতে আল্লাহ পাক সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, পৃথিবীতে মানুষের জন্ম, বর্ণ, ভাষা ও বংশের ভিন্নতার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষ মানুষের যথাযথ পরিচয় জানা। সম্মান-অসম্মান ও গর্ববোধ মানুষের মৌলিক গুণাবলীর অন্যতম। সুতরাং যে কোন গোত্রের যে কোন বর্ণের যে কোন দেশ বা এলাকার লোকই আল্লাহকে অত্যধিক ভয় করবে এবং তাঁর হুকুম-আহকাম, বিধি-নিষেধের অধিকতর অনুসরণকারী হবে, সে লোকই হবে অধিকতর সম্মানিত। তদ্রুপ যে কোন বংশের, বর্ণের ও দেশের লোক এসব ব্যাপারে অবহেলা ও গাফলতি করবে, সে ব্যক্তিই ইজ্জত ও সম্মান থেকে হবে বঞ্চিত। স্বজনপ্রীতির চরিত্র কিন্তু পবিত্র কোরআনের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত। স্বজনপ্রীতি বা আঞ্চলিকতার দৃষ্টিতে অন্য জাতি, দেশ বা এলাকার লোক বড়জোর মেহমান হিসেবে সদ্ব্যবহার পাবার যোগ্য। কিন্তু তাকে কখনও 'নিজের' মনে করা হয় না। যদিও বা সে জ্ঞান-বুদ্ধি, চারিত্রিক নৈপুণ্যে এবং শারীরিক ও মানসিক উপযুক্ততায় অনেক উচ্চ পর্যায়ের হয়ে থাকে। তবুও স্বজনপ্রীতি বা আঞ্চলিকতা তাকে এ অধিকার ও স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত নয়। নিজের দেশ ও জাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করবে, জীবন সমস্যার সমাধানে সে পথপ্রদর্শক হবে অথবা যে কোন পর্যায়ে সে তার উপর শাসন চালাবে, এক মুহূর্তের জন্যও সে তা মেনে নিবে না।

এটাই হচ্ছে সেই 'জাহেলী স্বজনপ্রীতি" যার বিরুদ্ধে প্রথম দিন থেকেই ইসলাম যুদ্ধ করে আসছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কথা ও কাজে সর্বদাই এই মানবতা বিরোধী আবেগ বিনাশ করার চেষ্টা করেছেন। এক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতই সফলকাম হয়েছেন যে, আরবের লোকজন একদিকে আফ্রিকান নিগ্রো হযরত বেলাল (রাযি.), ইউরোপের হযরত সুহাইব (রাযি.) এবং পারস্য বা ইরানের হযরত সালমান (রাযি.)কে আগে বেড়ে বরণ করে নিয়েছেন। অন্যদিকে স্বদেশী এবং স্বজাতি আবু জেহেল, আবু লাহাবের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছেন এবং তারা বাস্তবে একথা ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, যে কোন দেশ বা গোত্রের লোকই আল্লাহকে মানবে সেই আমাদের লোক। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর একত্ববাদের স্বীকৃতি দেবে না, সে যতই আমাদের রক্তের ও গোত্রের হোক না কেন, সে আমাদের লোক নয়।

www.pathagar.com

মক্কা বিজয়ের সময় রাসূল (সা.)-এর ঐতিহাসিক ঘোষণা :

معشر قريش! ان الله قد اذهب عنكم الجاهلية وتعظمها بالاباء

অর্থ: "হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আল্লাহ পাক তোমাদেরকে জাহেলী কর্মকাণ্ড থেকে মুক্ত করেছেন এবং বংশীয় অহংকারের দিন শেষ করে দিয়েছেন।"

বিদায় হজে লক্ষাধিক আরব বংশীয় সাহাবায়ে কেরামের মহাসম্মেলনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার চেয়ে আরও স্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন–

يايها الناس ! ان ربكم واحد وان ابائكم واحد كلكم لادم وادم من تراب اكرمكم عند الله اتقاكم وليس عربى على عجمى فضل الابالتقوا – الا كل شئ من امر الجاهلية تحت قدمى موضوع –

অর্থ: "হে লোকসকল! তোমাদের সবার প্রতিপালক একজন। তোমাদের সবার পিতা একজন। তোমরা সবাই আদম সন্তান, আর আদম মাটি থেকে সৃষ্ট। তোমাদের মধ্যে যে সর্বাধিক পরহেযগার সেই আল্লাহর নিকট সর্বাধিক সম্মানিত। পরহেযগারী ব্যতীত কোন অনারবের উপর কোন আরবীর শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শুনে রেখ! জাহেলী যুগের যাবতীয় রীতি-নীতি আমার পায়ের নিচে নিষ্পেষিত।"

কোরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট এই দিকনির্দেশনার পর কোন মুসলমানের পক্ষে জাহেলী যুগের এমন পঁচা-গান্ধা বিষয়াদি যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধ্বংস করে দিয়েছিলেন, সেগুলো গ্রহণ করা আমাদের জন্য মারাত্মক পথভ্রষ্টতা। বর্তমানে কোরআন হাদীসের ঢাক-ঢোল পিটিয়ে এসব জাহেলী বিষয়াদি পুনরুজ্জীবিত করা হচ্ছে। (عصبية) স্বজনপ্রীতির এই মানুষখেকো ভূত, যাকে ইসলাম সম্পূর্ণভাবে বিলোপ করে দিয়েছিল। এখন যারা ইসলাম মানে তারাই এসব ভূত পুনরায় প্রতিষ্ঠা করাচ্ছে। কথিত মুসলমানদের একটি বিশেষ গ্রুপ এসব বিষয়কে বেশ ইজ্জত ও সম্মানের

www.pathagar.com

সাথে লালন করে থাকে। যেমন– কিছুদিন পূর্বেও মিশরের কিছু লোককে ফেরাউনের বংশধর হিসেবে গর্ববোধ করতে দেখা গেছে।

কিন্তু যে দেশের গোড়াপত্তনই হয়েছে ইসলামের নামে, সে দেশেই এমন বক্তব্য শুনতে হয়েছে যে, 'রাজা দাহির হচ্ছে হিরো, আর মুহাম্মাদ বিন কাসিম ছিল লুটেরা।' 'সিন্ধু জাগো' নামে ইদানীং সিন্ধু প্রদেশে যে আন্দোলন চলছে তা যদি কেবল স্বাভাবিক অঞ্চলপ্রীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং 'সিন্ধু জাগো' স্লোগানের যদি একটিমাত্র দাবী হয়, তাহলে আমরা হাজারবার এ স্লোগানের সুরে সুর মিলিয়ে নিজেদেরকে সৌভাগ্যবান মনে করব। আমরা আন্তরিকভাবে চাই, এ অঞ্চল জাগুক এবং কেয়ামত পর্যন্ত জেগে থাকুক। ফলে, ফুলে সুশোভিত হয়ে এবং সুঅবস্থায় জাগুক। কিন্তু যদি এই স্লোগানের পিছনে 'স্বজনপ্রীতির' ঐ হীন মানসিকতা কাজ করে যা 'মুহাম্মদ বিন কাসিমের' মত ইতিহাস খ্যাত প্রশংসিত ব্যক্তিকে ঘৃণা করতেও 'রাজা দাহিরের' মত নোংরা ব্যক্তিকে ভালবাসতে অনুপ্রাণিত করে, তাহলে এমন আন্দোলনের ভিতে কোন যুক্তিসংগত কারণ থাকতে পারে না। এক সময় তো এমন ছিল যে, স্বয়ং রাজা দাহিরের স্বগোত্রীয় ও স্বধর্মীয় লোকজনই মুহাম্মাদ বিন কাসিমকে নিজেদের হিরো স্বীকৃতি দিয়ে তাঁকে বিশ্বাস ও ভালবাসার পুষ্পমাল্য পরিয়েছিল এবং তার ঘামের বদলা নিজেদের রক্তের বিনিময়ে পরিশোধ করাকে সৌভাগ্য মনে করত। দুঃখজনক ব্যাপার, আজ মুহাম্মাদ বিন কাসিমের স্বধর্মীয় লোকজনই তাকে লুটেরা সাব্যস্ত করে। রাজা দাহিরের কবরে পুষ্প অর্পণ করে। তাদের এ মানবতা বিধ্বংসী পরিবর্তন মুহাম্মাদ বিন কাসিমের ইজ্জত সম্মানের ন্যূনতম ঘাটতি হবে না। লোকজন অনেক কিছুই বলতে পারে কিন্তু এর দ্বারা বিশ্ব ইতিহাসের এই অমর কীর্তির কোন পরিবর্তন হবে না। পৃথিবীতে যতদিন সত্য ও সত্যবাদিতার অর্থ থাকবে ততদিন মানুষের অন্তর এ গৌরবোজ্জ্বল ও নিষ্কলঙ্ক সাফল্যকে আজীবন শ্রদ্ধা জানাবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এ স্লোগানদাতারা নিজে আপন মাতৃভূমি এবং এ এলাকার সাথে কি ন্যায়সঙ্গত আচরণ করছে? অতীতে সিন্ধু এলাকা ইল্‌ম ও দীনের বিরাট গুরুদায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে এসেছে। যার

www.pathagar.com

ইতিহাস জ্ঞানী পণ্ডিত পরহেযগার ও বুযুর্গদের মহান ব্যক্তিত্বে মূর্তিমান এবং সেই ব্যক্তিত্বের দরুন এ এলাকা মুসলিম বিশ্বে বিশেষ ইজ্জত ও সম্মানের স্থান হয়ে আছে।

রাজা দাহিরকে যারা হিরো বানিয়েছে তারা কি চান, ইন্দোনেশিয়া থেকে মরক্কো পর্যন্ত সমগ্র মুসলিমবিশ্ব নতুন করে অবগত হোক যে, সিন্ধু এলাকা রাজা দাহিরের অনুগামীদের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে এবং বর্তমানে সেখানে মুহাম্মাদ বিন কাসিমের কোন বন্ধু নেই; বরং এলাকাটি তার শত্রুদের বসতি। আল্লাহ না করুন, তাদের এই আন্দোলনে যদি এ ধারণা-সৃষ্টি হয়েই যায়, তাহলে মুসলিমবিশ্বের কাছে এ এলাকার ন্যূনতম ওজন ও সম্মান থাকবে না। আমাদের বিশ্বাস, এই স্লোগান পৃথিবীর যে প্রান্তেই পৌঁছবে সেখানে যদি ন্যায়-নীতির ন্যূনতম কোন চর্চা থাকে, তাহলে এ স্লোগানের নিন্দা ও বিরোধিতাই করবে। সিন্ধু অঞ্চল সম্পর্কে তারা যা করছে এটা কি আদৌ ন্যায়সঙ্গত হচ্ছে?

বস্তুত "সিন্ধু জাগো" বা "পাখতোনিস্তানের" নামে স্বজনপ্রীতির যে দুঃখজনক স্লোগান বা আন্দোলন হচ্ছে, তা কখনও বৈজ্ঞানিক এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি রাখে না। এমন কি এসব প্রত্যাখ্যানে কোন যুক্তি-তর্ক বা দলীল-প্রমাণাদিরও প্রয়োজন নেই। কিন্তু বর্তমানে নতুন প্রজন্ম তথা যুবক শ্রেণীকে উত্তেজিত করতে একটি হৃদয়গ্রাহী স্লোগানই যথেষ্ট। পরবর্তীতে এর দ্বারা কারও কোন ক্ষতি হয়ে গেলে, স্লোগানের উদ্‌গাতা ও প্রশিক্ষণদাতারা তার কোন সাহায্য-সহযোগিতা করবে না। যেহেতু আঞ্চলিক স্বজনপ্রীতির আন্দোলন মাতৃভূমির প্রতি ভালবাসার নামে শুরু হয়েছে, তাই সহজ-সরল যুবকরা সহজেই এর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে এবং এদেরকে এতই অবচেতন করে রাখা হয়েছে যে, এর দ্বারা ক্ষতিকর ফলাফল সম্পর্কে তাদের কোন অনুভূতিই নেই।

বিষয়টি অনুধাবন করতে সিন্ধু প্রদেশের এক ছাত্রীর চিঠির প্রতি লক্ষ করুন, যা করাচী থেকে প্রকাশিত দৈনিক 'হুররিয়াত' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। সে জাগো সিন্ধু আন্দোলনকে সমর্থন করে লিখছে–

www.pathagar.com

"রাজা দাহির একজন সিন্ধী। সে হিন্দু হোক বা মুসলমান হোক তাতে কিছু যায় আসে না, সে আমাদের হিরো। সময় আসলে সিন্ধুবাসী লোকজন মুহাম্মাদ বিন কাসিমকে ভর্ৎসনা করবে। শাহ লতীফকে সালাম জানাই, সালাম জানাই জি এম সায়্যেদকে। ইসলামের কারণে সিন্ধু সম্মানিত ও গর্বিত নয়; বরং মহেঞ্জোদারুর দরুন এ এলাকা গর্বিত। দেশের জন্য আমরা লক্ষ ইসলামকে কোরবানী দিতে প্রস্তুত। আমরা মেয়েরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আমরা নিজেদের সন্তানাদির নাম দাহির, হিমুকালাজী, ইয়ায ও হুশোর নামে রাখবো।"

(দৈনিক হুররিয়াত, ১৮ নভেম্বর, ১৯৬৮)

আরও একজন মহিলা লিখেছেন–

"যে ইসলাম ও পাকিস্তান আমাদের থেকে আমাদের সিন্ধু এবং সিন্ধু ভাষা হরণ করেছে। সেই ইসলাম ও পাকিস্তানকে আমরা আমাদের জন্য মারাত্মক-ধ্বংসাত্মক শত্রু মনে করি। সিন্ধু শুধু ইসলাম ও ইসলামী দর্শনের কারণেই মহান এমন দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভ্রান্ত। সিন্ধুর ইজ্জত সম্মান সেখানকার সাধারণ জনগণ, 'মহেঞ্জোদারু' 'কোটডিজির' প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন এবং লতীফ, সিজ্জিল, ইয়ায ও জি এম সায়্যেদ-এর মত কবি ও নেতৃবৃন্দের দরুন সিন্ধু গর্বিত ও মহান। নিজস্ব সংস্কৃতির কারণে সিন্ধু শ্রেষ্ঠ ও মহান।"

লেখাগুলো পড়ে ভীষণ কষ্ট পেতে পারেন, আফসোস হতে পারে। কিন্তু এজন্যে সম্পূর্ণভাবে দায়ী পাশ্চাত্যের শিক্ষা ব্যবস্থা। যা আমরা এখনও নতুন প্রজন্মের উপর সওয়ার করে রেখেছি। এই মানসিকতার সব দায়দায়িত্ব প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার উপর বর্তাবে। যার কারণে ওদের ব্রেন ও চিন্তা ইসলামী ভাবধারার জন্যে একেবারে রুদ্ধ হয়ে আছে। ইসলামিয়াতের ক্লাসে

www.pathagar.com

অল্প কিছুক্ষণ ভাসাভাসা কিছু আলোচনা হয়। কিন্তু তা কতক্ষণ? অথচ বাকী সব ক্লাসেই তো তাদের রগ-রিশায় পাশ্চাত্যের ঐ দৃষ্টিভঙ্গিরই অনুপ্রবেশ ঘটানো হচ্ছে, যা তার সমগ্র জীবনের বিশ্বাস ও চেতনার উপর শ্রেষ্ঠত্ব কায়েম করে বসছে।

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠ্যক্রমের প্রতি গভীরভাবে চিন্তা ও পর্যবেক্ষণ করলে প্রতিটি অনুচ্ছেদে, রগ-রিশায় পাশ্চাত্যের জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণা পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং এ অবস্থা যতদিন বহাল থাকবে ততদিন স্বজনপ্রীতির স্লোগানে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বস্তুত মানুষের মন-মানসিকতা স্বজনপ্রীতির বিষাক্ত ছোবল থেকে মুক্ত করার একটিই মাত্র পথ ও পদ্ধতি রয়েছে। আর তা হচ্ছে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার পাঠ্যক্রমকে খুব সতর্কতার সাথে পুনঃবিবেচনা ও পর্যালোচনা করে ক্লাসের মধ্যেই পাঠ্যসূচীতে ছাত্রদের মুসলিম জাতীয়তাবাদের প্রতি আকৃষ্ট করে তুলতে হবে।

স্বজনপ্রীতির বিস্তৃতির পেছনে আমাদের মারাত্মক একটি ভুল ও বোকামী, বহুলাংশে দায়ী। কারণ আমরা এখন পর্যন্ত মহেঞ্জোদারু, হরেপ্পা, কোট ডিজি, তক্ষশীলা প্রভৃতিকে নিজেদের সভ্যতা সংস্কৃতির উৎস ও কেন্দ্র হিসাবে উপস্থাপন করছি। এই প্রচারণা সরলতার সাথেই করা হচ্ছে, না কোন ষড়যন্ত্রমূলকভাবে করা হচ্ছে, তা বলা মুশকিল। ফলে এখন এসব প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শনকে পাকিস্তানী সংস্কৃতির পূর্বরূপ মনে করা হচ্ছে এবং ব্যাপকহারে ইজ্জত, সম্মান, ভালবাসা ও বিশ্বাসের সাথেই এসবকে স্মরণ করা হয়। যেন এগুলিই আমাদের সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্বের মূল কারণ এবং আমাদের অতীতের সাক্ষি।

দয়া করে একটু চিন্তা করে দেখুন তো! এতে কি ন্যূনতম কোন যৌক্তিক কারণ আছে? মহেঞ্জোদারু, হরেপ্পা প্রভৃতির অনৈসলামিক সভ্যতার সাথে আমাদের কিসের সম্পর্ক? কিসের ভিত্তিতে এসব সংস্কৃতিকে নিজেদের সংস্কৃতি মনে করছি? শুধু কি এ কারণেই যে, উপমহাদেশের বিভক্তিতে এসব এলাকা আমাদের অংশে পড়েছে? এ চিন্তাই যদি করা হয় তাহলে 'জাগো সিন্ধু' 'পাখতোনিস্তানের' আন্দোলনকে নিন্দা করার কি আছে?

www.pathagar.com

আল্লাহর অশেষ রহমত যে, স্বজনপ্রীতির এ আন্দোলন নির্দিষ্ট একটি সীমারেখায় আবদ্ধ এবং অধিকাংশ মুসলমানও এর ঘোরবিরোধী। সিন্ধু এলাকার গুটি কয়েক লোক রাজা দাহিরের নামে পুলকিত হয়। ইসলামের জন্যে জীবন উৎসর্গকারী অধিকাংশ সাধারণ জনগণ কিন্তু এ স্লোগানকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। এ বছরেরই রমযানে সাধারণ মুসলমান ইসলামের 'বিজয় দিবস' নামে মুহাম্মাদ বিন কাসেমকে যে উচ্চাসনে সমাসীন করেছে তা-ই প্রমাণ করে, সিন্ধুর সাধারণ জনগণ ইসলামী রীতি-নীতি ও জীবনধারা সংরক্ষণ করতে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত।

অতএব, যেসব কারণে 'স্বজনপ্রীতির' এ মানসিকতা সৃষ্টি হচ্ছে, সেগুলোর প্রতি যদি যথাযথভাবে লক্ষ রাখা না হয় এবং সত্যিকার ইসলাম কায়েম করা না হয়, তাহলে স্বজনপ্রীতির এ জোয়ার যে কোন মুসলিম রাষ্ট্রসত্তার উপর বড় ধরনের আক্রমণ করে বসবে। আজকে রাজা দাহিরকে হিরো বানিয়েছে, আগামীকাল রঞ্জিত সিং, মহারাজ ভাওকে হিরো বানিয়ে ফেলবে। এরপর শুধু মুহাম্মদ বিন কাসেমকে নয়; বরং সুলতান মাহমুদ গজনবী, সম্রাট জহীর উদ্দীন বাবর, আহমদ শাহ আবদালী এবং ইখতিয়ার উদ্দীন বখতিয়ার খিলজীকেও লুটেরা বলতে শুরু করবে এবং আশ্চর্যের কিছু নয় যে, ওরা যাদুকর, ইবলিস বা জিনকে হিরো বানিয়ে হযরত আদম (আ.)কেও লুটেরা হিসেবে সাব্যস্ত করে ফেলবে।

সাধারণ জনগণের মধ্যে এসব বিচ্ছিন্ন মানসিকতা সৃষ্টির পেছনে কিছু যৌক্তিক কারণও আছে। হয়ত দেখা যাবে দাবীকৃত এলাকায় অন্যান্য এলাকার তুলনায় অনেক বেশি সমস্যা জর্জরিত। তাই মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের কর্তব্য হল বিশেষ কমিশন গঠনপূর্বক এসব সমস্যাবলীর দ্রুত সমাধান করা এবং জনগণকে আশ্বস্ত করা। আমরা আবার স্বীকার করছি যে, কিছু কিছু এলাকায় প্রকৃতপক্ষেই যৌক্তিক সমস্যা রয়েছে। কিন্তু এর কারণে স্বজনপ্রীতির বিচ্ছিন্নতার স্লোগান কখনও সমস্যার সমাধান বয়ে আনতে পারবে না; বরং সমাধানের চেয়ে সমস্যাই বৃদ্ধি করবে বেশি। যার ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক ফলাফল ভোগ করতে হবে সমগ্র মিল্লাতকে।

www.pathagar.com

স্বজনপ্রীতির কারণ ও সমাধান

ইতিহাস প্রমাণ করে, বিজাতীয় শক্তি যখনই মুসলমানদের ক্ষতি করতে চেয়েছে, তখনই তারা মুসলমানদের মধ্যে আঞ্চলিক ও ভাষাগত জাতিপ্রীতির উন্মাদনা এবং বংশ-বর্ণে ও উঁচু-নীচুর পার্থক্য সৃষ্টির চেষ্টা করেছে। কারণ তারা ভালভাবেই অবগত যে, এসবই হচ্ছে পৃথিবী থেকে মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার সর্বোত্তম উপায়। সর্বোপরি মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় সত্তার উপর যদি আরও দু'একটা আঘাত করা যায় তাহলে তারা আজীবনের জন্য স্বস্তি পাবে এবং তাদের শ্রেষ্ঠত্বের জন্যে আর কোন হুমকি থাকবে না। মুসলমানদেরকে সরাসরি 'স্বজনপ্রীতি'র নামে নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিলে ব্যবহার করা বেশ দুরূহ। তাই শত্রুপক্ষ পরিকল্পিতভাবে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টির চেষ্টা করে, যাতে মুসলমানদের এক পক্ষকে অন্য পক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যায়। সে নিজে এক পক্ষকে অন্য পক্ষের উপর জুলুম-অন্যায় করতে উদ্বুদ্ধ করে। অন্যদিকে আবার সে নিজেই মজলুমের হক বা দাবী আদায়ের নামে জুলুম, অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার করে তোলে। পরস্পরের বিদ্বেষের এ আগুন একবার লেগে গেলে তা নিয়ন্ত্রণে আনা বেশ কষ্টসাধ্য।

সমগ্র মুসলিম বিশ্বে শত্রুরা এ পদ্ধতিই অবলম্বন করে আসছে। যেমন– বর্তমানে পাকিস্তানে যে আঞ্চলিক 'স্বজনপ্রীতি'র প্রাদুর্ভাব তা কিন্তু এদেশের জনগণের আসল বা প্রকৃত চেতনা নয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় বিশ্ববাসী দেখেছে, সে দেশের লোকজন কত আন্তরিকতা ও হৃদ্যতার সাথে মুহাজেরদেরকে গ্রহণ করেছে, আপন করেছে। দীর্ঘদিন যাবৎ এ সম্প্রীতি ও আনন্দঘনপূর্ণ সহঅবস্থান বজায় ছিল। এমনকি বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। কোথাও স্থানীয় ও অস্থানীয়ের ঝগড়া-বিবাদ ও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়নি। কিন্তু শত্রুদের কাছে মুসলমানদের এই সৌহার্দ্যপূর্ণ ঐক্য সহ্য হয়নি। তারা নেতৃস্থানীয় লোকজন দ্বারা এমন এমন কাজ করিয়েছে, যদ্দরুন অন্যপক্ষ বা শ্রেণীর লোকজন

www.pathagar.com

নিজেদেরকে মজলুম ও বঞ্চিত বলে মনে করছে। কোন কোন প্রদেশ বা এলাকাকে উচ্চ পর্যায়ের সরকারী ও সামরিক এবং বেসামরিক পদ ও দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করা হচ্ছে। কোন কোন এলাকার বিরাট জমিদারী অন্য এলাকার কিছু নির্দিষ্ট লোককে দিয়ে দেয়া হচ্ছে। এক এলাকায় অন্য এলাকার এমন গোঁড়া শাসক নিয়োগ করা হচ্ছে, যে স্থানীয় লোকজনের সাথে অত্যন্ত হীন ও নীচ আচরণ করে। মোদ্দাকথা, এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে যখনই মজলুম হওয়ার অনুভূতি জাগে তখন এর মূল হোতারা স্থানীয় ও অস্থানীয় বিভক্তির স্লোগান উঠিয়ে 'স্বজনপ্রীতি'র আগুন চারদিকে ছড়িয়ে দেয়। ন্যায়সঙ্গত দাবী আদায়ের এসব আন্দোলনে অত্যন্ত সুকৌশলে ও পরিকল্পিতভাবে বংশ, বর্ণ ও ভাষাগত বিভক্তিও অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।

পরবর্তীতে দেখা যায়, বর্ণ ও ভাষাই আন্দোলনের মূখ্য বিষয়ে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে তাদের ন্যায়সঙ্গত আসল সমস্যাবলী গৌণ হয়ে পড়ে। সাধারণ জনগণের জন্যে সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য যে, তারা শত্রুর কৌশল বুঝার পরিবর্তে সুন্দর কিছু স্লোগানের অনুসরণ করতে অভ্যস্থ হয়ে পড়ে। অন্যদিকে একথা অনুভব করারও তার কোন সুযোগ নেই যে, মূল আন্দোলন কিন্তু স্থানীয় ও অস্থানীয় সম্পর্কিত নয়। বরং ন্যায়-নীতি ও জুলুম-নির্যাতন সম্পর্কিত। বে-দীনী, সততা ও সুবিচার সম্পর্কিত। স্থানীয় ও অস্থানীয় হউক না কেন, বস্তুত আল্লাহভীতি এবং আখেরাতের চিন্তাহীন লোকজন যতদিন শাসক থাকবে ততদিন ন্যায়-নীতি ও সততা আসবে না। অত্যাচার ও বেদীনীর জন্য কোন এলাকা বা ভাষা দায়ী নয়। অত্যাচারী যে এলাকারই হউক এবং যে ভাষায়ই কথা বলুক, সে অত্যাচারী, সে বে-দীন। বস্তুত মূল সমস্যা কোন নির্দিষ্ট এলাকার লোকজন নয়। বরং অত্যাচারী ও বে-দীনদের কবল থেকে মুক্তিই মুখ্য উদ্দেশ্য, যা ছাড়া কখনও ইনসাফ আসবে না।

জুলুম-নির্যাতন, বে-দীনী ও খোদাদ্রোহিতা কোন বিশেষ এলাকার বা বংশ ও বর্ণের সাথে সম্পর্কিত নয়। মীর জাফর ও মীর সাদেক তো নিজের নৌকা নিজে ডুবিয়েছে। এজন্য সততা ও ন্যায়-নীতিকে কোন বিশেষ অঞ্চলের সাথে সম্পৃক্ত করা উচিত হবে না। সাধারণ জনগণ যে এলাকারই হউক না কেন খোদাদ্রোহী শাসনব্যবস্থা থেকে মুক্তি লাভই সবার মূল দাবী।

www.pathagar.com

যেখানে একজন শাসক আল্লাহর ভয়-ভীতিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে অন্যায়-অত্যাচারের স্টিমরুলার চালিয়ে রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছে। কেউ এর প্রতিরোধ করছে না, এমন কি বাধাও দিচ্ছে না। এমন অমানবিক নির্যাতনে ধৈর্য ধারণ বেশ সহজ। কিন্তু অভিযোগ করাটা বিরাট কঠিন। যেখানে সততা ও ন্যায়-নীতির বাহক পদে পদে বাধার সম্মুখীন। পক্ষান্তরে অত্যাচারী ও অসৎ লোকদের কামনা-বাসনা পূরণে রয়েছে লাগামহীন সুযোগ-সুবিধা। পুণ্য ও সততার পথ হচ্ছে রুদ্ধ। অন্যদিকে অসৎ কর্মের পথ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। সেখানে যতদিন পর্যন্ত খোদাদ্রোহী জীবনব্যবস্থার পরিবর্তন না হবে ততদিন পর্যন্ত কোন এলাকাতেই শান্তি আসবে না।

মুসলিমবিশ্বের সকল সমস্যার সমাধান হচ্ছে 'ইসলামী জীবন ব্যবস্থা'র যথাযথ বাস্তবায়ন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি ও প্রাধান্য এবং আল্লাহভীরু ও পরকাল বিশ্বাসীকে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করুন। তবে পাকিস্তানে অতীতে পাকিস্তানী দৃষ্টিভঙ্গী এবং জাতীয় ঐক্যের নামে প্রতারণা করার দরুন বর্তমানে সেখানে ইসলামী ঐক্যের স্লোগান দ্বারা 'স্বজনপ্রীতি'র আন্দোলন দমন করা যথেষ্ট দুরূহ হয়ে পড়েছে। যেহেতু অতীতে সেখানে ইসলামী ঐক্যের কথা বলে সাধারণ জনগণকে অধিকার বঞ্চিত করা হয়েছে। তাই আজ সেখানে ইসলামী ঐক্যের স্লোগানকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে। বর্তমানে যদিও সত্যিকার অর্থেই ইসলামী ঐক্যের ডাক দেয়া হয়, তবুও সাধারণ মানুষের মধ্যে এর প্রতি সাড়া জাগানো মারাত্মক কঠিন।

এই অবস্থার একমাত্র সুষ্ঠু পরিবর্তনের অর্থ হচ্ছে, অবস্থার এ নাজুকতা সরকারকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করে বিভিন্ন প্রদেশ বা এলাকার সমস্যাদি সামাধানে পূর্ণশক্তি ও সামর্থ ব্যয় করতে হবে। সাথে সাথে শাসকশ্রেণীকে নিজেদের কার্যক্রমে জনগণের মধ্যে এ ধারণা ও বিশ্বাস সৃষ্টি করতে হবে যে, সরকার তাদের সাথে সর্ব বিষয়ে সাম্য ও সততা বজায় রাখছে। অধিকন্তু যারা অন্যায়-অত্যাচার ও অবিচার করে জাতিগত বিভেদ ও সহিংসতা সৃষ্টি করেছে, তাদের প্রাদেশিক সরকার ভেঙ্গে দিতে হবে এবং ঐসব শাসক ও

www.pathagar.com

কর্মকর্তাদের অপসারণ করতে হবে। ঐসব রাজনৈতিক নেতাদেরও শাস্তি দিতে হবে, যারা এ সুযোগে 'স্বজনপ্রীতি'র ভয়ঙ্কর আগুন চারদিকে ছড়িয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিতে মশগুল।

জনগণের মৌলিক সমস্যা সমাধান করে যতদিন পর্যন্ত তাদেরকে সুবিচার ও সততা সম্পর্কে আশ্বস্ত না করা যাবে, ততদিন পর্যন্ত দুষ্টচক্র অধিকার আদায়ের নামে 'স্বজনপ্রীতি'র আবেগ ও গতি বৃদ্ধি করেই চলবে। যা যে কোন সময় যে কোন মুসলিম দেশের ধ্বংসের কারণ হয়ে উঠতে পারে।

এই সংঘাত এড়াতে জনগণেরও বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। যেখানেই 'স্বজনপ্রীতি'র ভয়ানক ক্ষতিকারক আন্দোলন সৃষ্টি হবে, সেখানকার চিন্তাশীল ও প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ নতুন ও পুরাতন তথা স্থানীয় ও অস্থানীয় উভয়পক্ষকে নিয়ে একটি যৌথ কমিটি গঠন করে দেবে। যে কমিটি পারস্পরিক ঐক্য, সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব ও সহযোগিতার বন্ধন সৃষ্টি করবে। যেমন– সিন্ধু প্রদেশে কিছু দুষ্টচক্রের লোকজন বিনা কারণে সিন্ধী ও মুহাজের অর্থাৎ স্থানীয় ও অস্থানীয়দের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ ও সহিংসতা সৃষ্টি করছে এবং উভয়পক্ষেই কিছু রাজনৈতিক নেতা এই বিভেদকে বাড়িয়ে তুলতে ইন্ধন যোগাচ্ছে। এখন সেখানে এমন একটি দল বা সংগঠনের প্রয়োজন যা স্থানীয় ও অস্থানীয় উভয়পক্ষকে নিয়ে গঠিত হবে। যার কাজ হবে উভয়পক্ষের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপন। পুরাতন সিন্ধী তথা স্থানীয়দের প্রতি কৃত অবিচার ও অন্যায়ের ক্ষতিপূরণের আন্দোলন করবে নতুন তথা অস্থানীয় সিন্ধী লোকজন। পক্ষান্তরে সিন্ধীর নতুন অধিবাসীদের (মুহাজের) প্রতি কৃত অন্যায় ও অবিচারের ক্ষতিপূরণের আন্দোলন করবে স্থানীয় অধিবাসীরা। এভাবে বাস্তবে প্রমাণ করতে হবে যে, এলাকার সমস্ত অধিবাসী এক ও অভিন্ন এবং তারা পরস্পরে দুঃখ-সুখের অংশীদার।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও দ্বি-জাতিতত্ত্ব

কোন ব্যক্তি বা জাতি যদি বিরাট কোন দুর্ঘটনায় মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পরও উপযুক্ত শিক্ষাগ্রহণ না করে উল্টো বুঝতে শুরু করে, তখন সে ব্যক্তি বা জাতির দুর্ভাগ্যের আর কোন সীমা থাকে না। যে জিনিস তার ধ্বংসের কারণ সেটাকে তখন সে নিজের সফলতার উপকরণ মনে করে বসে। পক্ষান্তরে যে কাজে তার সাফল্য ও উন্নতি নিহিত সেটাকে সে ধ্বংসের কারণ বলে ধরে নেয়।

পৃথিবীর প্রত্যেক জাতি ও সভ্যতারই উত্থান-পতন হয়েছে। বিরাট বিরাট ঘটনা-দুর্ঘটনা তাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। পাহাড়সম সমস্যা-সঙ্কুল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। এতদসত্ত্বেও সে জাতি যদি পরিস্থিতি যথাযথ অনুধাবন করতে পারে এবং উপযুক্ত ও সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে, তাহলে সে জাতি যাবতীয় সমস্যা কাটিয়ে ও মুকাবিলা করে একদিন তার মঞ্জিলে মকসুদে নিশ্চিত পৌছবেই পৌছবে। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে সে জাতির ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস যদি বিকৃত হয়ে যায়, তাহলে তাদের সাফল্য ও উন্নতির কোন নিশ্চয়তা নেই। বাংলাদেশের স্বাধীনতা পাকিস্তানের জন্য একটি মহা শিক্ষা। এমন অসংখ্য পণ্ডিত, শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ লোক আছেন, যারা সাবেক পূর্বপাকিস্তানের এ বিপ্লবকে অন্তর দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করে উপযুক্ত শিক্ষা ও ধারণা নিতে সক্ষম। কিন্তু পাকিস্তানের রাষ্ট্রযন্ত্র যাদের নিয়ন্ত্রণে তাদের অনুভব শক্তি ও হতবুদ্ধিতায় মারাত্মক ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হচ্ছে। অন্যদিকে পৃথিবীর যে অপশক্তিগুলো অবশিষ্ট পাকিস্তানকেও সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দিতে বদ্ধপরিকর তারাই পাকিস্তানীদের মধ্যে এমন এমন ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-ভাবনা সৃষ্টি করতে উঠে পড়ে লেগেছে, যা তাদেরকে শিক্ষাগ্রহণ ও সতর্ক হওয়ার সরল ও সঠিক পথ থেকে বিভ্রান্ত করে নিশ্চিত ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। পূর্বপাকিস্তানের বিপ্লব ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর উপমহাদেশে বেশ কিছু ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক কথা বার্তার ব্যাপক প্রচারণা

www.pathagar.com

চলছে। প্রথম সারির কিছু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, উঁচুমানের লেখক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবী এসব অবান্তর চিন্তাভাবনা প্রচারে বিরামহীনভাবে লেগে আছেন। কেউবা ইতোমধ্যে এসব অপপ্রচারে প্রভাবিত ও বিভ্রান্ত হয়েও পড়েছেন। তাই সত্যান্বেষী বাস্তববাদী লোকজন এসব অপপ্রচারে বিভ্রান্ত ও প্রতারিত না হওয়ার জন্য বক্ষ্যমাণ নিবন্ধ।

প্রথমত প্রচার করা হচ্ছে যে, যে দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতায় এর অসারতা ও ভ্রান্ততা প্রমাণিত হয়েছে। এ ধারণা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারত থেকে সৃষ্ট। এমনকি ভারতের (বাংলাদেশের স্বাধীনতাকালীন) প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রীসহ আরও অনেকেই তাদের প্রত্যেক বক্তৃতা বিবৃতিতে বিষয়টি রটানোর কঠিন শপথ নিয়ে রেখেছে। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের অনেক নেতা ও লেখকও আজ এ ধারণা প্রচার শুরু করে দিয়েছেন। এমন কি খোদ পাকিস্তানের অনেককেও বলতে শুনা যাচ্ছে, পশ্চিম পাকিস্তানেও এক জাতি নয়; বরং ভিন্ন ভিন্ন চারটি জাতির আবাস এখানে।

প্রশ্ন হল, বাংলাদেশের স্বাধীনতায় দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভুল প্রমাণ হয় কি করে? পাকিস্তানী শাসকদের স্বৈরতান্ত্রিকতা, অদূরদর্শিতা, ব্যর্থতা ও পরাজয়ই কি এর কারণ? নাকি ভারতের ষড়যন্ত্রের শিকার হওয়া বা এদের ফাঁদে আটকে যাওয়াই এর কারণ? বাতেলের হাতে বন্দুক গেলে তা-ই হক হয়ে যাবে? বস্তুত এ যুক্তি কোন বুদ্ধিমান বা জ্ঞানী ব্যক্তি বিশ্বাস ও সমর্থন করতে পারে না। তবে ধরেই যদি নেয়া যায় যে, '৭১ সনে ভারতের সাময়িক বিজয়ে মিথ্যা সত্যে পরিণত হয়ে গেছে। সুতরাং হিন্দু-মুসলিম সব বাঙালী এখন এক জাতি। তাহলে মিসেস ইন্দিরা গান্ধী পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশের অধীনস্থ করে দেননি কেন? অথচ এই মহিলা বাঙালী জাতির দেবীর মর্যাদা রাখে। তাহলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরও পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত পার্থক্যের বৈধতাই বা কি?

বস্তুত বাংলাদেশের স্বাধীনতায় দ্বি-জাতিতত্ত্বের যৌক্তিকতা মোটেও খর্ব ও দুর্বল হয়নি; বরং আরও দৃঢ় ও শক্তিশালী হয়েছে। পূর্বপাকিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে যার ন্যূনতম ধারণা আছে তাকেও একথা বিশ্বাস করানো

www.pathagar.com

যাবে না যে, দ্বি-জাতিতত্ত্বের কারণে এ বিচ্ছিন্নতা সংঘটিত হয়েছে। বরং দ্বি-জাতিতত্ত্বের প্রতি ধারাবাহিক ও দীর্ঘ অবহেলার দরুনই তা হয়েছে। পূর্ব-পাকিস্তানের এক পঞ্চমাংশ হচ্ছে হিন্দু অধিবাসী। দ্বি-জাতিতত্ত্বের চেতনা অনুযায়ী যদি তাদেরকে ভিন্ন জাতি হিসেবে অভিন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া না হত; বরং তাদেরকে সংখ্যালঘুদের জন্য পৃথক নির্বাচনে অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা করা হত, তাহলে পূর্বপাকিস্তানের অবস্থা আজকের মত না হয়ে অন্য রকমও হতে পারত। অথচ এতদাঞ্চলের হিন্দুরা অত্যন্ত চতুরতার সাথে এ বাস্তব সত্যটাকে আড়াল করে অভিন্ন নির্বাচনী পদ্ধতি চালু করে। ফলে অনেক মুসলিম নেতাই এই ২০% সংখ্যালঘুর খেলনায় পরিণত হয়। এভাবে এই এলাকার রাজনীতিতে হিন্দুরা সহজেই আধিপত্য বিস্তার করে বসে। যে কারণে তারা দেশ ও জাতির শত্রুদের উদ্দেশ্য হাসিলে আওয়ামী নেতৃবৃন্দকে বাধাহীনভাবে ব্যবহার করতে পেরেছে। যার শেষ পরিণতি হিসেবে এদেশকে ভারতের দাসত্বের শিকলে আবদ্ধ করেছে।

১৯৭০ সনের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সত্যিকার অর্থেই ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল। তাদের এ সাফল্য কিন্তু স্বাধীনতার নামে আসেনি। বরং স্বাধীনতার সংকল্প প্রত্যাখ্যান করে হরণকৃত নিজেদের ন্যায্য রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার আদায়ের নামে এ বিরাট সফলতা পেয়েছিল। কিন্তু এই ন্যায়সঙ্গত দাবী আদায়ের আন্দোলনে ভারত লাভবান হয়ে তাদেরকে গোলামীর জিঞ্জির পরিয়ে দেবার আশঙ্কা তারা যদি ন্যূনতমও অনুভব করতে পারত, তাহলেও বাংলার মুসলমানগণ বিশেষত মুক্তিবাহিনীর মুসলমানেরাই হাজারবার এ আন্দোলন ও সংগ্রামকে প্রত্যাখ্যান করত। অভিশাপ দিত। মূলতঃ ইন্দিরা গান্ধী, মানেক শাহ ও জেনারেল অরোরা তথা ভারতের গোলাম ও পদলেহনকারী বানানোর লক্ষ্যেই যাবতীয় আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু তাদের জন্য দুঃখের বিষয় যে, অল্প কয়েক বছরের মধ্যে তাদের এ টার্গেট লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যায়।

তর্কের খাতিরে যদি কিছু সময়ের জন্যে মিথ্যাকেই সত্য বলে মেনে নেয়া হয়। অর্থাৎ দ্বি-জাতিতত্ত্বের কারণেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা– তবুও দ্বি-জাতিতত্ত্বের যৌক্তিকতা খর্ব হয় কি করে? এর বিশ্লেষণ এভাবে করা যায়

www.pathagar.com

যে, পাকিস্তানের যেসব প্রদেশে তাদের বিভিন্ন অধিকার হরণের অভিযোগ রয়েছে বা দাবী-দাওয়া আছে, তারা তাদের অধিকার ও দাবী আদায়ের আন্দোলন ও সংগ্রাম করতেই পারে। কিন্তু এই দাবী আদায়ের আন্দোলন যদি বিচ্ছিন্নতার আন্দোলনে রূপ নেয়, তাহলে সেই প্রদেশ অনিবার্যভাবে ভারতের বিনা-পয়সার গোলামে পরিণত হবে। যেমন– আজকের স্বাধীন বাংলাদেশকে ভারত বন্ধকী জমির মত ব্যবহার করতে চায়। গঙ্গার ন্যায্য পানির হিস্যা থেকে বাংলাদেশকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। বঙ্গোপসাগরসহ অনেক সীমান্ত এলাকা জবর-দখল করে নিয়েছে। বস্তুত ১৯৪৭ সাল তথা ভারত বিভক্তিকালে দ্বি-জাতিতত্ত্ব যতটুকু বাস্তব, যথার্থ ও সঠিক ছিল আজকের এই দিনেও ঐ পরিমাণ বাস্তবতা ও যথার্থতাই অক্ষুণ্ন আছে। কোন সত্য মতবাদ ও চেতনা তার ধারক-বাহকের অন্যায়, অসততা ও অপকর্ম এবং পারস্পরিক বিরোধের কারণে সেই দর্শনের যৌক্তিকতা ও উপযুক্ততায় কোন হেরফের হয় না। খর্ব হবে না এর যথার্থতা ও মৌলিকত্ব। মুসলমান ও হিন্দু এখনও ভিন্ন ও পৃথক দু'টি সম্প্রদায়। উভয় জাতির জীবন-পদ্ধতি, উদ্দেশ্য ও ধ্যান-ধারণায় আজও আকাশ-পাতাল বৈপরীত্য। বাংলাদেশের স্বাধীনতা থেকে পাকিস্তানের শাসকদের উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ জন্যে তাদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

(ক) বিভিন্ন প্রদেশের যৌক্তিক অভিযোগ এবং ন্যায্য দাবী পূর্ণাঙ্গরূপে যত শীঘ্র সম্ভব পূরণ করা।

(খ) অতীতের ভুল-ত্রুটি উদার মন-মানসিকতা নিয়ে স্বীকার করে সবগুলো প্রদেশের মধ্যে সাম্য ও ন্যায় নিশ্চিত করতে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। যাতে যৌক্তিক দাবী ও অভিযোগের অজুহাতে ষড়যন্ত্রকারীরা কোন অসৎ উদ্দেশ্য হাসিলের সুযোগ না পায়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর কিছু লোক এমন ইবলিসি প্রচারণাতে সার্বক্ষণিক মশগুল যে, ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কারণেই আজকের এই বিভক্তি। পাকিস্তানের ইতিহাসে এই প্রথম কেউ এমন নোংরা ও অপবিত্র ধারণা প্রকাশ্যভাবে বলার সুযোগ পেল। এ শয়তানি প্ররোচণা

www.pathagar.com

বিতর্কে জড়ানো কোন জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ভদ্র লোকের কাজ নয়। তবে এ প্রচারণা ঐসব লোকজনই করছে যারা পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামী মূল্যবোধ কায়েমে বাধা সৃষ্টি করে এসেছে। যারা এদেশে একদিনের জন্যও ইসলামী নেজামকে বাস্তবে রূপ দিতে দেয়নি। যারা আঞ্চলিক স্বজনপ্রীতির ক্ষতিকারক প্ররোচণা দিয়েছে সাধারণ লোকজনকে। আল্লাহ-ভীতি ও পরকালীন চিন্তার মূলোৎপাটন করতে চেয়েছে যারা। ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার পরিণতি যখন জাতি ভোগছে, ঠিক তখন ওরাই সব দায়-দায়িত্ব ইসলামের ওপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে। অথচ পাকিস্তান এই জীবন-দর্শনের ভিত্তিতে একদিনও পরিচালিত হয়নি। আশ্চর্যের ব্যাপার যে, যারা সারা জীবন ইসলামের বিরোধিতা করল, পদে পদে ইসলামকে প্রতিরোধ করে আসল, মদ, গাঁজা সারাক্ষণ সেবন করল। গান-বাজনা ও নৃত্যে মগ্ন থাকল অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার প্রসার ঘনিয়ে নিজস্ব সভ্যতা-সংস্কৃতি ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে একেবারে ধুলোয় মিশিয়ে দিল, অফিস আদালতে ঘুষের ব্যাপকতা এবং অনিয়মকেই যারা নিয়মে পরিণত করল, ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতারণা, শিক্ষাঙ্গনে খোদাবিরোধী প্রচারণা এবং মসজিদগুলোকে শূন্য করে নাইট ক্লাব ও বারগুলো সুসজ্জিত করল, বঞ্চিত ও গরীবের অধিকার ও পাওনা আদায়ের পরিবর্তে যারা রক্ত নিতে প্রস্তুত ছিল, শ্রম ও চেষ্টার পরিবর্তে আরামপ্রিয়তাকে যারা অধিকতর জাতীয় চেতনা বলে সাব্যস্ত করেছিল। ঐক্যের পরিবর্তে আঞ্চলিকতা ও গোত্রপ্রীতি সৃষ্টি করে যারা দেশের নিরাপত্তার উপর চরম আঘাত হানল। এসব কার্যক্রমের দরুন যখন পরবর্তীতে তাদের উপর পরাজয় ও অপমানের শাস্তি আরোপিত হল– তখন তারা যাবতীয় দায়-দায়িত্ব ইসলামের উপর চাপিয়ে সহজে নিজেদেরকে মুক্ত করে নেয়ার চেষ্টা করছে।

দেশ-বিদেশের অনেকেই পাকিস্তানের এ পরাজয়কে তাদের জাতীয় নৈতিক অবক্ষয়ের পরিণতি মনে করে। তবে দুঃখজনকভাবে বর্তমানে কিছু সাহিত্যিক, সাংবাদিক এ পরাজয়কে ধর্মীয় অপকর্মের সাথে সম্পর্কহীন বলে অপপ্রচারের চেষ্টা করছে এবং এর স্বপক্ষে আশ্চর্য আশ্চর্য বিষয়াদি তারা উপস্থাপন করছে। যেমন– পাকিস্তানীদের যদি মদপান ও অশ্লীলতার কারণে

www.pathagar.com

পরাজয় হয়ে থাকে তাহলে এসব কুকীর্তি ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যেও তো ছিল। কিন্তু তাদের পরাজয় হল না কেন? কিন্তু এ যুক্তি খেজুর গাছের সাথে কুয়ার তুলনার মত। বিশ্ব ইতিহাস প্রমাণ করে মুমিন ও কাফেরের মধ্যে চিন্তা-চেতনা ও কার্যক্রমের দিক দিয়ে আকাশ-পাতাল পার্থক্য এবং একেক দলের সাথে প্রকৃতির আচরণও একেক রকম। অমুসলিম সম্প্রদায়ের পক্ষে মদ, গাঁজায় বুঁদ হয়ে এবং খোদাদ্রোহিতার পর পার্থিব জীবনে সাময়িক আনন্দ উপভোগ সম্ভব। পক্ষান্তরে যে সম্প্রদায়ের খামীরই উঠানো হয় আল্লাহ ও রাসূলের নামে, যারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্য করার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, বাহ্যিক উপকরণের চেয়ে আল্লাহর সাহায্য সহযোগিতার উপর যাদের অধিক ভরসা– ইসলামী হুকুমাত পরিহার করার দরুন অপমান ও পরাজয় ছাড়া সে সম্প্রদায়ের আর কোন ভাল পরিণতি হতে পারে না।

তাদের সাথে আল্লাহ পাকের আচরণ সর্বদাই এমন। পুরোপুরি আনুগত্যের সময় উপকরণের স্বল্পতা সত্ত্বেও তারা বৃহৎ শক্তির শত্রুদের সাথে বিজয় ও সাফল্য লাভ করেছে। অন্যদিকে অবাধ্য ও নাফরমানীর সময় পর্যাপ্ত উপকরণ থাকার পরও অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও ছোট ছোট শক্তির শত্রুদের কাছেই পরাজয় বরণ করতে হয়েছে।

www.pathagar.com

ইরানের আড়াই হাজার বছর পূর্তি উৎসব

ইরান আমাদের সর্বাধিক প্রিয় প্রতিবেশী দেশ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত ইরানের সাথে পাকিস্তানের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অটুট রয়েছে। উভয় দেশের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব, সহমর্মিতা ও সহযোগিতাপূর্ণ অভিন্ন সম্পর্ক অনেক যুগ অতিবাহিত হয়েছে। যা অন্যান্য প্রতিবেশীর জন্য ঈর্ষার কারণ ছিল। বস্তুত উভয় দেশের জনগণ একে অপরকে ভাই বলে জানে এবং সর্বদাই একে অপরের উন্নতি ও সাফল্য কামনা করে থাকে। আমরা নিজের দেশের মতই ইরানের শান্তি, নিরাপত্তা, উন্নতি, দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব কামনা করি। ইরানের জনগণের আনন্দকে নিজেদের আনন্দ মনে করি। তাদের দুঃখ-কষ্ট আমাদের অন্তরে রক্তক্ষরণ সৃষ্টি করে।

ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসার এ সম্পর্ক মূলত ভৌগোলিক অভিন্নতার কারণে নয়; বরং এ সম্পর্ক তাওহীদ, রিসালাত ও পরকালের সেই দৃঢ় বিশ্বাসের উপর স্থাপিত যা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মানুষকে বিশ্বাসের দৃঢ় ও স্থায়ী অভিন্ন এক সূত্রে আবদ্ধ করে রেখেছে। যতদিন পর্যন্ত এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে উভয় দেশ পরিচালিত হবে ততদিন পর্যন্ত পৃথিবীর কোন শক্তিই উভয় দেশের জনগণকে পৃথক করতে পারবে না। এ অবস্থা কেবল পাকিস্তান আর ইরানের জন্যই প্রযোজ্য নয়; বরং পৃথিবীর সকল মুসলিম দেশের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেই তা সমভাবে প্রযোজ্য।

মুসলিম দেশসমূহের পারস্পরিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক যেহেতু ইসলামের শক্তিশালী আকীদা-বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত; তাই তাদের মধ্যকার এই ভালবাসার সম্পর্ক কোন আনুষ্ঠানিক, বাহ্যিক ও কৃত্রিম সম্পর্ক নয়; বরং তা সেই প্রাকৃতিক ও বাস্তবিক ভালবাসার সম্পর্ক যার শিকড় অন্তরের গভীর থেকে উত্থিত। যে ভালবাসা হৃদপিণ্ডের গভীর পর্যন্ত অনুপ্রবেশিত। এ সম্পর্ক আকর্ষণীয় কথামালা, প্রতারণা ও অনুষ্ঠানসর্বস্ব নয়। এ সম্পর্কের নিজস্ব কিছু দাবী চাহিদা ও স্বতন্ত্র কিছু নিয়ম-পদ্ধতি রয়েছে। যার প্রথম দাবী হচ্ছে, কেউ যদি তার অপর কোন ভাইয়ের কোন বিষয় বা কথা ভুল ও ভ্রান্ত বলে মনে

www.pathagar.com

করে তাহলে তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা এবং যে কোনভাবে তাকে নেফাকের সম্পৃক্ততা থেকে বিরত রাখা। বন্ধুত্বের এ পবিত্র দাবীর ভিত্তিতে ইরানের বর্তমান শাসকদের উদ্দেশ্য করে কিছু বিষয় আলোচনা করব। সেই সৎ মানসিকতা নিয়ে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধ। আশা করি পাঠকরা বিষয়টিকে সেভাবেই গ্রহণ করবেন।

আসছে অক্টোবরে ইরানের বর্তমান শাসকগোষ্ঠী তাদের আড়াই হাজার বছর পূর্তির রাজকীয় উৎসব পালনের ঘোষণা দিয়েছে এবং এর ব্যাপক প্রস্তুতিও চলছে। আমরা ইরানের জন্যে দুআ করি, আল্লাহ পাক যেন এর অধিবাসীদের অফুরন্ত সুখ ও শান্তি দান করেন। কিন্তু 'আড়াই হাজার বছর পূর্তির রাষ্ট্রীয় উৎসব' আমাদের বুঝে আসছে না। আমরা অনুধাবন করতে পারছি না যে চৌদ্দশত বছর পূর্বের ইরানের সাথে আজকের ইরানের কি সম্পর্ক? আর কোন মিলন সূত্রের ভিত্তিতে আজকের তাওহীদ ও রেসালতবাদী ইরান দুই থেকে আড়াই হাজার বছর পূর্বেকার পারস্য ইতিহাসকে নিজেদের ইতিহাস বলে সাব্যস্ত করতে চায়? অথচ আমরা জানি, প্রায় চৌদ্দশত বছর পূর্বে হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাযি.) ও হযরত খালেদ ইবনে ইরফাজা (রাযি.) কর্তৃক এ অঞ্চলে সংঘটিত কল্যাণকর বিপ্লব দারা ও পারভেজের মত সম্রাটদের সাথে তাদের ছিন্ন করে মানবতার সন্ধানদূত বিশ্বনেতা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সঙ্গীদের সাথে তাদেরকে সম্পৃক্ত করে দিয়েছে। কিসরা বা পারস্য সম্রাটের প্রধান সেনাপতি রুস্তমের সামনে হযরত রবী ইবনে আমের (রাযি.) বলেছিলেন– 'মানব জাতিকে পার্থিব সংকীর্ণতা থেকে উদারতা ও প্রশস্তির দিকে আনয়নে এবং অন্যান্য ধর্মের জুলুম-নির্যাতন থেকে মুক্ত করে ইসলামের শান্তি, নিরাপত্তা ও ন্যায়পরায়ণতার ছায়াতলে আশ্রয় দেয়ার জন্যে আল্লাহ পাক আমাদেরকে প্রেরণ করেছেন।' পরিবর্তিত এসব মরুবাসী কর্তৃক এ অঞ্চলের মানুষকে প্রদত্ত সত্যিকার সুখ-শান্তি, নিরাপত্তা ও ন্যায়পরায়ণতা এবং বড়-ছোট ও ধনী-গরীবের পার্থক্য বিমোচনের বাস্তবতা বিশ্ববাসী অবলোকন করেছে।

www.pathagar.com

আর এ কারণে সেখানকার লোকজন এ বিপ্লবে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছে। তাদের ধর্ম, চাল-চলন, রীতি-নীতি, সভ্যতা-সংস্কৃতিসহ পুরো জীবন ধারাতেই এমন পরিবর্তন এসেছে, যা তাদেরকে এমন নতুন এক জাতি ও সম্প্রদায় হিসেবে আবির্ভূত করেছে যাতে মনে হয় রুস্তম, বাহরাম ও পারভেজের সাথে তাদের আদৌ কোন সম্পর্ক ছিল না। যে জাতি অতীতে নির্দিষ্ট এক অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল, যার ইতিহাস নির্দিষ্ট এক রাজবংশের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, তারা আজ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সদস্য হওয়ার সুযোগ পেল। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিমে যার সীমাহীন বিস্তৃতি। যার ইতিহাস নবুওয়াত ও রেসালাতের এমন আলোতে উদ্ভাসিত– সমগ্র বিশ্বকে যা হেদায়াতের জ্যোতিতে দেদীপ্যমান করেছে।

বর্তমান ইরানকে বিশ্ববাসী এমনি এক বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের সদস্য হিসাবেই জানে। আর তাই একে ইসলামী বিশ্বের মধ্যে গণনা করা হয় এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্ব দেশটিকে নিজেদের এক প্রিয় সদস্য ও ভাই বলে মনে করে। দেশটির জন্য আল্লাহ পাকের সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ হল, অগ্নিপূজকদের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করে সৃষ্টির সেরা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তাদের সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া। দেশটির লোকজনকে মনে রাখা প্রয়োজন, বর্তমান ইরানের সাথে চৌদ্দশত বছরের পূর্বকার পারস্যের আকাশ-পাতাল সমপরিমাণ বিস্তর পার্থক্য। সংকীর্ণ ভৌগোলিক সীমার সামান্য ভূ-ভাগ ব্যতীত উভয়ের মধ্যে আর কোন সামঞ্জস্য নেই। আজকের মুসলিম ইরানের হিরো দারা, নওশেরওয়া বা রুস্তম ও সোহরাব নয়; বরং মাসনা ইবনে হারেসা, সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, নুমান ইবনে মুকরিন, মুগীরাহ ইবনে শুবা, কা'কা ইবনে আমর ও তাদের যেসব প্রতিনিধি যারা এ অঞ্চলে ইসলামের মশাল প্রজ্জ্বলিত করেছে– তারা হচ্ছেন আধুনিক ইরানের হিরো।

আলোচ্য দৃষ্টিভঙ্গিতে চিন্তা ও ভাবা প্রয়োজন। বর্তমান ইরানের আড়াই হাজার বছর পূর্তি উৎসব রাষ্ট্রীয়ভাবে পালন কতটুকু যুক্তিসঙ্গত? এ উৎসব পালনের মাধ্যমে তারা কি বিশ্ববাসীর সামনে এটা উপস্থাপন করতে চায় যে, ইরানীরা আবার সেসব রাজা-বাদশাহকে তাদের আকীদা ও ভালবাসার

www.pathagar.com

কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করছে– যাদের একজন দু'জাহানের সম্রাট হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লা-এর পত্র ছিঁড়ে ফেলেছিল। সে প্রেক্ষাপটে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

اذا هلك كسرى فلاكسرى بعده

অর্থ: "এই কিসরা ধ্বংস হয়ে গেলে পরবর্তীতে আর কেউ কিসরা হতে পারবে না।"

কত মারাত্মক ও ভীতিকর কথা! যা ব্যাখ্যা করার মত ভাষা আমাদের জানা নেই। এ উৎসব পালনে মুসলিম জাতিসত্তাবোধের মারাত্মক মর্যাদাহানী ঘটবে। যা কেবল ইসলামের শত্রুপক্ষের আনন্দের খোরাক যোগাবে না; বরং এ কারণে ইসলামী ইতিহাসের প্রথম যুগের স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাসের প্রতিও বড় ধরনের আঘাত আসবে।

মুসলমানদের ঐক্য ধ্বংস করার জন্যে ইসলামের শত্রুরা শত শত বছর যাবত অনেক ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পেতে রেখেছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিকারক ফাঁদ হচ্ছে জাতীয়তাবাদী (Nationalism) ধ্যান-ধারণা। বর্ণ, বংশ ও অঞ্চলের ভিত্তিতে জাতীয়তার প্রবক্তা হচ্ছে এই মতবাদ। পক্ষান্তরে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মতবাদ ও দর্শন এসবের একেবারে মূলোৎপাটন করে বর্ণ-বংশের শ্রেণী ও পার্থক্যহীন এক বিশ্ব জাতি সৃষ্টি করেছে। বিশ্ব ঐক্যের আহ্বান নিয়ে যে জাতির আবির্ভাব যা তাগুত ও কুফরের যাবতীয় অপশক্তিকে দুমড়ে-মুচড়ে দিয়েছিল এবং এমন জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল যার মাধ্যমে মানুষ শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে তার ইহকাল ও পরকালকে সাফল্যমণ্ডিত করতে পেরেছিল। বর্ণ, বংশ ও অঞ্চলের পরিবর্তে আকীদা-বিশ্বাস ও চেতনা ভিত্তিক এই বিশ্ব ঐক্যই শত্রুদের চক্ষুশূলের কারণ। তাই ওরা এই ঐক্য নস্যাতে পরিকল্পিতভাবে বার বার মুসলমানদের মাঝে বর্ণ, বংশ ও আঞ্চলিক সমস্যা সৃষ্টি করছে। ইতিহাস বলে এ সমস্যায় মুসলমানরা যুগে যুগে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

www.pathagar.com

বর্তমান মুসলিম বিশ্বে পশ্চিমা চিন্তা-চেতনা ও ভাবধারার যে আগ্রাসন চলছে সেই মহা সমস্যাকে জাতীয়তাবাদ (Nationalism) নাম দিয়ে একটি ফ্যাশন হিসেবে দাঁড় করিয়েছে। পাশ্চাত্যের শিক্ষাব্যবস্থায় গঠিত ও লালিত মানসিকতা সম্পন্ন আধুনিক শিক্ষিত লোকজন মতবাদটিকে সহজেই লুফে নিয়েছে। ফলে আরবী ও তুর্কী সমস্যা সৃষ্টি হলে হাজার বছরের প্রতিষ্ঠিত মুসলিম খেলাফতব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যায়। সমগ্র মুসলিম বিশ্ব অসংখ্য ছোট ছোট রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং বিশ্ব ইসলামী ঐক্য সুদূর পরাহত হয়ে যায়।

মুসলিমবিশ্বের সতত বিচ্ছিন্নতার পরও শত্রুপক্ষের আতঙ্ক কিন্তু কাটেনি। কখন জানি এসব লোক ঐক্যবদ্ধ হয়ে পড়ে! এজন্য প্রতিটি মুসলিম দেশে ওরা জাতীয়তাবাদ ও স্বজনপ্রীতির ধ্যান-ধারণা প্রচারে সর্বাত্মক ও নিরলস প্রয়াস চালিয়ে আসছে।

নতুন প্রজন্মের মুসলিম মন-মানসিকতা থেকে ইসলামী ঐক্যের ন্যূনতম ধারণাটুকুও নষ্ট করতে প্রতিটি মুসলিম দেশের জনগণের অতীত সম্পর্ককে মুসলিম পূর্বসূরীদের পরিবর্তে অমুসলিম পূর্বসূরীদের সাথে স্থাপনের চেষ্টায় সার্বক্ষণিক ব্যস্ত। ইসলামী জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে গড়ে উঠা সঙ্কীর্ণ ভৌগোলিক ও জাতীয়তাবাদের যাবতীয় আন্দোলন এই উদ্দেশ্যে সুচারুরূপে বাস্তবায়নে পরিচালিত ও ব্যবহৃত। এমতাবস্থায় মুসলিমবিশ্বের দায়িত্ব যেমন বিরাট, তেমনি নাজুক। সর্বোচ্চ সতর্কতা, গভীর অনুধাবন ও দূরদর্শিতা অবলম্বন প্রয়োজন এবং যেসব পদক্ষেপ ও কার্যক্রমে মুসলমানদের পরিবর্তে অমুসলমানদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন হয় বা তাদেরকে কাছাকাছি টেনে নিয়ে আসে, সেসব কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করতে হবে।

দুঃখের বিষয়, মুসলিমবিশ্বে এই অনুভূতি খুবই কম; বরং নাই বললেই চলে এবং বিভিন্ন মুসলিম দেশ ক্রমান্বয়ে শত্রুদের এ ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হচ্ছে। কয়েক যুগ পূর্বে মিশরের কিছু লোক ফেরাউনের সাথে তাদের অতীত সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেছে। ফলে তারা ফেরাউনের বেশ কিছু ভাস্কর্য স্মারকও স্থাপন করেছে। এমনিভাবে পাকিস্তানের কিছু লোকও

www.pathagar.com

সিন্ধু প্রদেশে রাজা দাহিরের সমাধিস্থানে পুষ্পমাল্য অর্পণ করে নিজেদের স্বৈর-মানসিকতা ও বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিল। আর এখন ইরানের আড়াই হাজার বছর পূর্তি রাষ্ট্রীয়ভাবে পালনের মাধ্যমে প্রকারান্তরে কিসরার শাসনেরই স্তুতি পেশ করা হচ্ছে। মুসলিমবিশ্বে যদি এ প্রবণতা আরও গতিশীল হয়, তাহলে এটা অসম্ভবের কিছু নয় যে, এক সময় সৌদি আরবের লোকজনও আবু জাহেল ও আবু লাহাবের স্মারক উৎসব শুরু করে দেবে! ইরাকের লোকজন নমরুদকে তাদের হিরো সাব্যস্ত করে নিবে! সিরিয়ার লোকজন রোম সম্রাটদের স্মরণ করতে থাকবে। ইয়ামনে আদ ও সামুদ গোত্রের ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থাপত্যের পুনঃজাগরণ হবে।

ভাবা যায়, এসব কার্যক্রমের ভবিষ্যত পরিণাম কি হবে? হীরার বিনিময়ে পাথর ক্রয়ের এ পদক্ষেপ মুসলিম জাতিকে কোথায় নিয়ে যাবে? যারা সর্বপ্রথম স্বজনপ্রীতির ভূতের উপর আক্রমণ করেছিল। যাদের মহানায়ক, মানবতার মহানদূত হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় গোত্রের ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলেছিলেন। পক্ষান্তরে পারস্যের সালমান, হাবশার (আফ্রিকার) বেলাল, রোমের সুহাইবকে গলায় জড়িয়ে ছিলেন।

www.pathagar.com

সাবেক আমেরিকান প্রেসিডেন্ট নিক্সনের একটি বক্তব্যের আলোকে

আমেরিকা ও ইসলাম

পৃথিবী আজ দুই মেরুতে বিভক্ত। দুই পরাশক্তি আমেরিকা ও রাশিয়ার বিভক্তিতে কিছু দেশ আমেরিকান ব্লকে সম্পৃক্ত। সেসব দেশ 'ডানপন্থী' দেশ হিসেবে পরিচিত। কিছু দেশ রাশিয়ার ব্লকে সম্পৃক্ত, যারা 'বামপন্থী' দেশ হিসেবে চিহ্নিত। আবার এমন কিছু রাষ্ট্র আছে যারা নিজেদেরকে তৃতীয়-ধারার 'সম্পর্কহীন' রাষ্ট্র হিসেবে আখ্যায়িত করে। কিন্তু এসব দেশের এই ব্লকের সাথে তারাও সম্পর্কযুক্ত।

আমাদের দেশ যেহেতু প্রথম থেকেই সর্বোচ্চ পর্যায়ে আমেরিকার সাথে সম্পর্কযুক্ত, তাই এখানে আমেরিকান প্রোপাগান্ডার প্রভাব বেশী। যার প্রধান লক্ষণ হচ্ছে, এখানকার ইসলামী গ্রুপগুলির মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ও বদ্ধমূল ধারণা যে, ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য রাশিয়া থেকে আমেরিকা তুলনামূলক সহায়ক বা কাছাকাছি। সুতরাং কখনো যদি ঐ দুই ব্লকের কোন একটাকে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, তখন আমেরিকাকেই অবলম্বন করা যেতে পারে। পক্ষান্তরে রাশিয়ার ব্যাপারে তারা ভাবতেও নারাজ। ঠিক একই অবস্থা বামপন্থী রাষ্ট্রগুলোতেও।

যার সামগ্রিক ফলাফল হচ্ছে, ঐ ব্লকের অন্তর্ভুক্ত মুসলিম দেশগুলিতে যেসব দল 'ইসলামী নেজাম' ও 'শাসন ব্যবস্থা' প্রবর্তনের প্রত্যাশী তাদেরকে সাধারণত ডানপন্থী দল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তারাও নিজেদেরকে ডান পন্থীদের সাথেই সম্পৃক্ত রাখেন। এমনকি এ পরিচয়ে তাদের কোন আপত্তিও নেই। তাই দেখা যায়, পৃথিবীর যেখানেই ডানপন্থী ও বামপন্থীদের মাঝে লড়াই বা সংঘর্ষ হয় তখন একে 'ইসলাম ও কুফর' -এর যুদ্ধ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। যেমন ইন্দোনেশিয়ায় যখন বামপন্থী সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও বিপ্লব চলে, আমাদের দেশে তখন তা কুফরের বিরুদ্ধে ইসলাম রক্ষার আন্দোলন বলে প্রচারিত হয়।

www.pathagar.com

আমরা মুসলমানরা এ প্রতারণার শিকার হয়ে ইতিমধ্যে অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছি। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে শত্রুতার ব্যাপারে দুই পরাশক্তিই একও অভিন্ন পর্যায়ে এবং এক্ষেত্রে কেউ কারও চেয়ে কোন অংশে কম নয়; বরং রাশিয়া ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য যতটুকু মারাত্মক ক্ষতিকারক আমেরিকাও তা-ই। প্রতিদ্বন্দ্বী দুই পরাশক্তির মধ্যে যদি কোন মিল বা ঐক্য খোঁজে পাওয়া যায়, তবে ইসলামের শত্রুতা সবার শীর্ষে থাকবে।

পার্থক্য কেবল একটাই, মুসলিম দেশগুলোতে কমিউনিজমকে প্রতিরোধ করতে আমেরিকা শুধু ইসলামের নামটা ব্যবহার করছে। কারণ সমাজতন্ত্রে অর্থনৈতিক সাম্য এবং দারিদ্র্য বিমোচনের এমন স্লোগান রয়েছে যা সহজ-সরল সাধারণ মানুষতো বটেই, অনেক সুচতুর ও সচেতন জ্ঞানী ব্যক্তিদেরকেও প্রবঞ্চনায় ফেলে দেয়। এমনকি সাধারণ লোকজন একে তাদের একান্ত মনের কথার বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করে। ফলে তৃতীয় বিশ্বের শিক্ষার হার কম যে সব দেশে, সে সব দেশে এ মনোপ্রবঞ্চনার স্লোগানের জোয়ার কোন দার্শনিক বা হিসাববিজ্ঞানের যুক্তিতে অনুমান করা যাবে না। এ জোয়ার প্রতিরোধে সেসব দেশে এমন এক নতুন আবেগময় স্লোগানের প্রয়োজন, যা এক নিমিষেই মানুষের অন্তর থেকে সমাজতন্ত্রের দাবী মুছে দেবে। মুসলিম দেশগুলোতে 'ইসলামের চেয়ে বেশী আবেগপ্রবণ ও প্রভাব বিস্তারকারী কোন কিছু নেই। কারণ প্রতিটি মুসলিম শিশুই তার অন্তরে ইসলামের জন্যে 'জীবন বিসর্জন' করার স্বপ্ন লালন করে।

তাই আমেরিকান পলিসি হলো, ঐসব দেশে ইসলামের হৃদয়গ্রাহী এই স্লোগানকে সমাজতন্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী করে কমিউনিজমকে প্রতিরোধ করা। কিন্তু সত্যিকার অর্থেই ইসলাম ও ইসলামী-জীবনব্যবস্থার সাথে কারও সম্পর্ক এক মুহূর্তের জন্যেও আমেরিকার কাছে সহনীয় নয়; বরং 'ইসলামী' স্লোগান দ্বারা তার স্বার্থসিদ্ধি হবার পর সেখানেই 'সত্যিকার ইসলাম' প্রতিরোধে অধিক গুরুত্ব ও সূক্ষ্মভাবে নিরলস প্রয়াস চালায়।

যেসব মুসলিম দেশ ডান ব্লকের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ আমেরিকাপন্থী সেসব দেশ কেবল ইসলামের নাম প্রচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। গরম বক্তৃতা,

www.pathagar.com

আকর্ষণীয় বর্ণনা এবং জাকজমকপূর্ণ সম্মেলন, মহাসম্মেলন ও কনফারেন্সের মধ্যেই তাদের ইসলামের সম্পর্ক সীমাবদ্ধ। ইসলাম কেবল পত্রিকার রিপোর্ট, প্রবন্ধ, সভা, সেমিনার, পাণ্ডিত্যপূর্ণ বই-পুস্তকের আকর্ষণীয় বিষয় ও সৌন্দর্য। পাকিস্তান, মিশর, জর্ডান, তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া, মরক্কোসহ অন্য যেসব মুসলিম দেশ ডান ব্লকের অন্তর্ভুক্ত সবখানে একই অবস্থা। যেখানেই 'ইসলামী নেজাম বা শাসন ব্যবস্থা' কায়েমের চেষ্টা চলে সেখানেই সরকার তার যাবতীয় শক্তি ও ক্ষমতা 'ইসলামী হুকুমত'-এর বিরোধিতার পেছনে ব্যয় করে। ধর্মীয় চর্চা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং তা দমন করতে একেবারে মূল শিকড়ে আঘাত করে। যেমন– মদ্যপায়ীতা, নগ্নতা-অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার ব্যাপকতা প্রসারিত করে। টিভি, ভিসিআর ও ডিসের মাধ্যমে ঘরে ঘরে পশ্চিমা চরিত্রহীনতার অনুপ্রবেশ ঘটানো হচ্ছে। কেউ যদি এসবের বিরোধিতা করে হয়তো তার মৃত্যুর আশঙ্কা, আর না হয় প্রতিক্রিয়াশীল, উন্মাদ, পশ্চাতবাদী ও মৌলবাদী (Fundamentalist) হিসেবে অভিযুক্ত হতে হবে।

অন্যদিকে রাশিয়া অনেকদিন পর্যন্ত 'ধর্মবিরোধী' কৌশল অবলম্বন করে যখন সমগ্র বিশ্বব্যাপী ব্যাপক সমালোচনা ও নিন্দার পাত্রে পরিণত হলো, তখন তারা অনুভব করল যে, আমেরিকা মুসলিম দেশগুলোতে ধর্মকে তাদের জন্যে বিরাট বাধা হিসেবে দাঁড় করিয়েছে। ফলে তারাও কৌশল পরিবর্তন করে অনেক দেশে আমেরিকান ডিপ্লোমেসি গ্রহণ করে নেয় এবং প্রচার করতে থাকে যে, ধর্ম প্রকৃতপক্ষে সমাজতন্ত্রের জন্যে কোন বাধা নয়; বরং এর সহায়ক। বিশেষ করে ইসলাম তো পৃথিবীতে এসেছে সমাজতন্ত্রের বাস্তব প্রতিফলন ঘটাতে। সমাজতন্ত্রী ব্লকে ইসলামকে শুধু স্লোগান বা প্রচারই করেনি; বরং এর বাস্তব শিক্ষাকে বিলুপ্ত বা পরিবর্তন করে ভিন্নভাবে এর ব্যবহার শুরু করে দেয়। আলজেরিয়া, লিবিয়াসহ বাম ব্লকের দেশগুলোতে এখন যথেষ্ট জোরালোভাবে ইসলামের নাম নেয়া হচ্ছে। এমনকি খাঁটি ইসলামের প্রতিনিধিত্বকারী বলে দাবিও করছে। কিন্তু যখনই 'সত্যিকার ইসলাম' কায়েমের প্রশ্ন আসে তখন ঐ পরিমাণ জুলুম-নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হয় যা ডানপন্থী দেশগুলোতে হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

উপরের বিশ্লেষণে সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইসলাম বিদ্বেষ, বিরোধিতা ও প্রতিরোধের ক্ষেত্রে এক সময়ে যদিও আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে পার্থক্য ছিল এখন কিন্তু আর তা নেই। 'সত্যিকার ইসলাম' কায়েম প্রতিরোধে উভয়ের একই নীতি ও পদ্ধতি। এখন ইসলামের নামে কারও কোন আপত্তি নেই। উভয়েই নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধিতে এর ব্যাপক ব্যবহার করছে। 'সত্যিকার ইসলাম' যে উভয়েরই ধ্বংসের কারণ সে ব্যাপারে সবারই সম্যক ধারণা রয়েছে। যখন দেখবে 'সত্যিকার ইসলাম' এসে গেছে তখন এদের একজন তৃতীয় এক নতুন শক্তিরূপে আবির্ভূত হয়ে উভয়ের কাজ সেরে ফেলবে।

বস্তুত ইসলাম বিরোধিতার ক্ষেত্রে আমেরিকা ও রাশিয়া এক। এক্ষেত্রে সমঝোতা ও চুক্তি থাকা অবাক হওয়ার কিছু নয়। আমি ওদের মাঝে অনেক পূর্ব থেকেই এ ব্যাপারটা অনুভব করছিলাম। যতই দিন সামনে আসছে ততই যেন তা সত্যে পরিণত হচ্ছে। কিছুদিন পূর্বে আমেরিকার এক বিরাট ব্যক্তিত্ব এই সত্যটুকুকেই আরো জোরালো ও স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করলেন। সেই বিরাট ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন সাবেক আমেরিকান রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সন। যিনি অনেক বছর আমেরিকার রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন। তার এ বক্তব্য সামগ্রিকভাবে আমেরিকার ধ্যান-ধারণা ও বক্তব্যের প্রতিফলন বলা যেতে পারে।

প্রায় দেড় বছর পূর্বে আমেরিকা থেকে প্রকাশিত মাসিক ফরেন এ্যাফেয়ার্স (Foreign Affairs) পত্রিকায় আমেরিকা ও রাশিয়া সম্পর্কে তিনি একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সংখ্যাটি চলতি মাসেই আমার পড়ার সুযোগ হয়েছিল। তাতে তিনি লিখেছেন–

> While we should hold the Soviets accounntable for the action they take that are opposed to our intersts, we should recognis that they are not responsible for all of the troubles in the world. The income gap between nation that provide raw materials and those that consame them; famine bute to climate auces, radical Muslim

www.pathagar.com

fundamentalist and Terrorist movements emanating from Libya and Iran all of these problems would exist even if Soviet Uninon did not exist. But rather than exaloiting sure problous the Soviet Union should join the United States and other western nations in cosgating them. The Soviet should be especially Concorned about the rise of Muslim fundamentalism, not only because one-third of the population, of the Soviet Union is Muslim, but also beacuse the Muslim revolution completes with the revolution for the people in third World Nations.

(Richard Mion; Foreign Affairs; October. 1985)

অর্থ: "আমরা (আমেরিকানরা) রাশিয়াকে ঐসব আগ্রাসনের জন্যেই দায়ী করি যা কেবল আমাদের স্বার্থবিরোধী। এখানে আমাদেরকে অনুধাবন করতে হবে যে, পৃথিবীর যাবতীয় সমস্যার জন্যে রাশিয়া কিন্তু দায়ী নয়। যেমন– কাঁচামাল উৎপাদনকারী ও ব্যবহারকারী দেশসমূহের মধ্যকার আমদানী-রপ্তানী বৈষম্য, বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ, মুসলিম মৌলবাদী আন্দোলন ও বিপ্লব এবং ইরান ও লিবিয়া কর্তৃক সৃষ্ট ও সমর্থিত ভয়ানক সন্ত্রাসী আন্দোলন। এসব সমস্যা রাশিয়া না থাকলেও হত। অন্যসব কিছু বাদ দিয়ে রাশিয়াকে এসব সমস্যা মোকাবিলায় সর্বাধিক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কথা। আর তা কেবল রাশিয়ার এক তৃতীয়াংশ মুসলিম অধ্যুষিত বলে নয়; বরং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে ইসলামী আন্দোলন সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে প্রতিরোধের ক্ষমতা অর্জন করে নিবে।"

www.pathagar.com

এই হলো ডানপন্থীদের শীর্ষ এক নেতার মানসিকতা। যাদেরকে রাশিয়ার তুলনায় ইসলামের নিকটবর্তী মনে করা হয়। 'মুসলিম মৌলবাদ' নামে নতুন একটি পরিভাষা আমেরিকা থেকেই বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হয়েছে। যার লক্ষ্য হচ্ছে ইসলামী ধ্যান-ধারণা ও আকীদা-বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত মুসলমানদেরকে নতুন এক আন্দোলনের প্রতি ধাবিত করা। এই 'মুসলিম মৌলবাদ'কে সমগ্র বিশ্বজুড়ে নিন্দা ও ঘৃণার পাত্র বানিয়ে শব্দটিকে একটি গালিতে রূপান্তরিত করে ফেলেছে। রিচার্ড নিক্সন তার প্রবন্ধে যেভাবে সন্ত্রাস ও দুর্ভিক্ষের সাথে শব্দটাকে মিলিয়ে এক সাথে উল্লেখ করেছেন, তাতে তার তীব্র বিদ্বেষ, ঘৃণা, শত্রুতা ও বিরোধিতারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। যা 'সত্যিকার ইসলাম' সম্পর্কে তাদের অন্তরে অবস্থিত পাহাড়সম বিরোধিতার যৎসামান্য নমুনা।

বিষয়টি এভাবে বলা যেতে পারে–

"তাদের মুখ থেকে বিদ্বেষ প্রকাশ পেল
আরও যা তাদের অন্তরে রয়েছে, তা অনেক বেশী।"

ব্যাপারটা এখানে শেষ নয়। প্রবন্ধটিতে যে বিদ্বেষ ও শত্রুতা প্রকাশ পেয়েছে তা এক সাধারণ দৃশ্যপট। বরং মি. নিক্সন-এর সাথে সাথেই তার একমাত্র প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী রাশিয়াকে এ সমস্যা মোকাবিলায় আমেরিকার সাথে একসঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রস্তাব দিয়েছেন। আবার সাবধানও করে দিয়েছেন যে, রাশিয়ার জন্যই মুসলমানরা সবচেয়ে বেশী ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়াবে। কারণ রাশিয়ার এক তৃতীয়াংশ মুসলমান জনবসতি এবং অত্যাচারিত জনগণের পক্ষে ইসলামের নিকট এমন এক শান্তি ও মুক্তির জীবন বিধান রয়েছে, যা যে কোন সময় সমাজতন্ত্রের জন্যে মৃত্যু ডেকে আনতে পারে। মি. নিক্সনের প্রবন্ধটি পড়ে 'ইবলিসের পরামর্শ সভা' নামক আল্লামা ইকবালের কবিতাটি মনে পড়ে। যেখানে ইবলিস তার চেলাদের সামনে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে যেয়ে বলছিল–

"আমি জানি আগামীতে কেমন রঙিন বিবর্তন বা দুর্ভাগ্য আসবে
ব্যক্তিকেন্দ্রিক অন্যকোন সমস্যা নয়; বরং তা ইসলাম।'

www.pathagar.com

যাই হউক, আমরা সাবেক আমেরিকান রাষ্ট্রপতি মি. রিচার্ড নিক্সনের প্রতি কৃতজ্ঞ। কারণ, তিনি তার এ বক্তব্যে আমাদের ধারণাকেই সুস্পষ্টভাবে সত্য প্রমাণিত করলেন যে, ইসলামের শত্রুতার ক্ষেত্রে আমেরিকা ও রাশিয়া উভয়ে এক ও অভিন্ন এবং তাদের কারো চেয়ে কেউ কোন অংশে কম নয়।*

---

* টিকা : উল্লেখ্য, লেখক মূল প্রবন্ধটি আজ থেকে প্রায় ১৫ বছর পূর্বে লিখেছেন। তখনকার সময়ে আমেরিকার ইসলাম বিরোধিতা সম্পর্কে অনুমান করা বিরাট দুরূহ ব্যাপার ছিল। কিন্তু স্নায়ুযুদ্ধোত্তর বিশ্ব পরিস্থিতিতে আজকের এই দিনে তা কেবল সত্য ও যথার্থ বলেই প্রমাণিত হচ্ছে। ইরাক, ফিলিস্তিন, বসনিয়া, চেচনিয়া, ফিলিপাইন, কাশ্মীরসহ সমগ্র বিশ্বে আজ আমেরিকার ইসলাম বিরোধিতা স্বরূপে উদ্ভাসিত। বিশেষত বর্তমান আফগান ও ওসামা বিন লাদেন ইস্যুতে তা এক অসহনীয় নিদারুণ বাস্তবতা ও সত্যে পরিণত এবং মুসলমানদেরকে যে আমেরিকা কতটুকু খেলনায় পরিণত করতে চায় তার অবিশ্বাস্য এক ট্রাজেডী। রাশিয়ার বিরুদ্ধে যাদেরকে আমেরিকা বীর ও সত্যের পতাকাবাহী বলে ঘোষণা দিয়েছিল, যাবতীয় সাহায্য সহযোগিতা করল সে আফগানদেরকেই সন্ত্রাসের অপবাদ দিয়ে পৃথিবীর বুক থেকে নাস্তানাবুদ করে দেবার যাবতীয় আয়োজন করে বসল। যার একমাত্র কারণ 'সত্যিকার ইসলাম' কায়েমের উদগ্রীবতা ও প্রচেষ্টা। এক সময় আমেরিকা আফগানদের জন্য সবকিছু করেছে। তার অর্থ এই নয় যে, আফগানিস্তান একটি সত্যিকার ইসলামী রাষ্ট্র হবে। একটি মডেল হবে। আমেরিকার এই বিদ্বেষী ও হিংস্র মনোভাবটা আজ আমাদের অনুভব ও উপলব্ধি করা প্রয়োজন এবং সমগ্র মুসলিমবিশ্বের পররাষ্ট্রনীতিতে এই চেতনার নব সংযোজনের একান্ত প্রয়োজন। তবেই নব্য সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমা আধিপত্যবাদ থেকে মুক্ত হবার পথ উন্মুক্ত হবে। নচেৎ আরও বহুকাল এভাবে নিষ্পেষিত হতে হবে।

(দৈনিক ইনকিলাব- ০১/৬/০২ ইং)

www.pathagar.com

তুরস্কে নবজাগরণ

কিছুদিন পূর্বে আমেরিকার প্রসিদ্ধ ম্যাগাজিন ক্রিশ্চিয়ান সাইন্স মনিটরে তুরস্কের এই ইহুদী লেখকের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে– যা পরবর্তীতে বিভিন্ন দেশের ইংরেজী পত্র-পত্রিকা এবং ম্যাগাজিনও প্রকাশ করেছে। বিষয়টি যেহেতু সমগ্র মুসলিমবিশ্বকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তার খোরাক যুগিয়েছে, তাই প্রথমে প্রবন্ধটির কিছু অনুবাদ এবং পরবর্তীতে এ প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা-পর্যালোচনা উল্লেখের দাবী রাখে।

প্রবন্ধটির শিরোনাম হচ্ছে–

'তুরস্কে ইসলামের নবজাগরণ
আধুনিকপন্থীদের জন্যে ভীতির কারণ।'

আলোচ্য প্রবন্ধটিতে লেখক লিখেছেন যে, "বর্তমান ইসলামের নবজাগরণের ক্রমবর্ধমান অগ্রযাত্রার ফলাফল নিয়ে তুরস্কের অনেক অধিবাসীকে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে গভীর চিন্তা-ভাবনা করতে হচ্ছে এবং এ আন্দোলন দেশটির সংসদীয় গণতন্ত্র নস্যাৎ করে সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করতে পারে। এমনকি দেশটি দুই ভাগে বিভক্তির আশঙ্কাও প্রবল হয়ে উঠায় তারা মহাদুশ্চিন্তাগ্রস্ত। (কথিত) আধুনিকপন্থী ও মুক্তচিন্তার অধিকারী লোকজন মনে করছে, আধুনিক গণতান্ত্রিক তুরস্কের প্রতিষ্ঠাতা মুস্তাফা কামাল (আতাতুর্ক) পঞ্চাশ বছর পূর্বে যে ধর্মহীনতার উপর ভিত্তি স্থাপন করে গিয়েছিল, তা বর্তমান ইসলামী স্রোতের দ্বারা হুমকির সম্মুখীন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট সুলাইমান ডেমির‍্যালের পশ্চাতবাদী শাসন এবং তার সরকারী দল (জাস্টিজ পার্টি) এ ধরনের কোন শঙ্কা ও হুমকির সম্ভাবনাই মানতে রাজী নয়।

যতদিন পর্যন্ত কামাল আতাতুর্কের রাজ কায়েম ছিল এবং একদলীয় শাসন ছিল, ততদিন পর্যন্ত (Fanaticism) ধর্মীয় গোড়ামী প্রসূত কোন আন্দোলনের আত্মপ্রকাশের সম্ভাবনাই ছিল না। কিন্তু ১৯৫০ সনে যখন পুরোপুরি সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রচলন শুরু হল, সাথে সাথে পশ্চাতবাদীদের

www.pathagar.com

পুনর্জাগরণ শুরু হতে লাগল। উল্লেখ্য, তখন আদনান মিন্দ্রিসের ডেমোক্রেটিক পার্টি ক্ষমতাসীন ছিল এবং তিনি পশ্চাতবাদী গ্রামীণ জনাধিক্যের ভোট ও সহযোগিতা পাবার লক্ষ্যে 'ধর্মীয়গোড়ামী'কে সহনীয় করে নিয়েছিলেন। অতঃপর ১৯৬০ সনে সামরিক অভ্যুত্থানে আদনান মিন্দ্রিসকে ক্ষমতাচ্যুত করে এক বছরের মধ্যে তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। বর্তমানে যে রাজনৈতিক দল (জাস্টিজ পার্টি) তুরস্কের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, তাদেরকে আজ ব্যাপকভাবে (আদনান মিন্দ্রিসের) ডেমোক্রেটিক পার্টির নতুন রূপ বা উত্তরসূরী মনে করা হচ্ছে এবং তাদের প্রতি রয়েছে আদনান মিন্দ্রিসের পথ অবলম্বন করার গুরুতর অভিযোগ।

আতাতুর্কের সংস্কারের উপর হামলা

বস্তুত যারা তুরস্কে ইসলামী পুনর্জাগরণ সৃষ্টিতে সচেষ্ট, তারা বর্তমান সরকারের উদারপন্থী নীতি ও কার্যক্রম থেকেও অনেক বেশী উৎসাহী ও বিপ্লবী মানসিকতাসম্পন্ন। অনেক মসজিদের ইমামকেই তাদের আলোচনা ও বক্তব্যে আতাতুর্কের নীতি ও সংস্কারের প্রতি হামলা করতে দেখা যায়। অনেক লোক জনতো সরাসরি ইসলামী শরীয়তের (বিধি-বিধানের) পূর্ণ বাস্তবায়ন দাবী করছে। অনেকে আবার 'পর্দাবিরোধী' নীতির বিরুদ্ধাচরণ করছে। এমনকি মহিলাদেরকে সমস্ত শরীর ভালরূপে আবৃত রাখতে বাধ্য করার হুমকি পর্যন্ত দিচ্ছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে লোকজন আতাতুর্কের যেসব প্রতিকৃতি ও ছবি স্থাপন করেছিল, আজকাল এসবের বিরুদ্ধেও কথা উঠতে শুনা যাচ্ছে। গত কয়েক মাসের মধ্যে ব্যাঙের ছাতার (Mushrooms) মত হঠাৎ করে প্রচুর সংখ্যক পশ্চাতবাদী পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন ও বই-পুস্তকে দেশটি ছেয়ে গেছে এবং অনেকগুলোতে পুনরায় 'ধর্মীয় শাসনে' প্রত্যাবর্তনের দাবী ঘোষণা করা হচ্ছে।

দেশে ব্যাপকহারে কট্টর ধর্মীয় সংগঠনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তাদের প্রচার প্রপাগান্ডার মূল লক্ষ্য হচ্ছে বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে 'খেলাফত'-এর পুনর্বহাল করা (আতাতুর্ক ১৯৪৬ সনে যে

www.pathagar.com

শাসনব্যবস্থা ধ্বংস করেছিল)। এসব সংগঠনকে প্রতিবেশী অন্যান্য আরব দেশের ইখওয়ানুল মুসলিমিনের মত সংগঠনের ভাবধারা সম্পন্ন মনে হয়।

গ্রামীণ এলাকায় আলেম-ওলামারা সরকারী ধর্মনিরপেক্ষ স্কুলগুলোকে যথেষ্ট শক্তহাতেই প্রতিরোধ করে চলেছেন। মূলত সরকারী স্কুল ঐসব এলাকার প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম হওয়ায় ধর্মপাগলদের জন্যে বিরাট সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। ফলে নবপ্রজন্মের বিরাট একটা সংখ্যা রাষ্ট্রবিরোধী ঐসব বিদ্যালয়ের প্রতি স্বভাবতই ঝুঁকে পড়ছে।

চলতি মাসের প্রথম দিকের কথা। আন্‌কারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী ফ্যাকাল্টির এক ছাত্রী হিজাব পরিধান করে আসলে তাকে বের করে দেয়া হয়। ফলশ্রুতিতে সমস্ত ছাত্র হরতাল আহ্বান করে বসল এবং ফ্যাকাল্টির ডীনের অপসারণ দাবী করে। এমনকি ছাত্ররা তাকে 'ছাত্রশত্রু' বলে ঘোষণা দেয়। ঘটনাটি অনেকদিন যাবত তুরস্কের পত্র-পত্রিকার প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। পক্ষান্তরে ছাত্রীটিকে সহায়তা করার জন্যে জাস্টিজ পার্টির কিছু সদস্য বিষয়টিকে সংসদে পর্যন্ত উত্থাপন করেছেন।

সবুজ পতাকার উত্থান

তুরস্কে এমন কিছু সংগঠন রয়েছে যারা নিজেদেরকে জাতীয়তাবাদী (Nationalist) বলে দাবী করে। কিন্তু কমিউনিজম এবং রাষ্ট্রের বাম ভাবধারার ক্রমবর্ধমান প্রেক্ষাপটে তারা এর প্রতিবাদ ও বিরোধিতার নামে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলছে এবং গণমিছিল আয়োজন করছে। আন্‌কারা ও ইস্তাম্বুলে যেসব মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে সেখানে অনেককেই সবুজ পতাকা ধারণ করতে দেখা গেছে (যা ইসলামী প্রতীকের প্রতিনিধিত্ব করে) এবং বলিষ্ঠ কণ্ঠে 'তুরস্কে কেবল ইসলামই বিজয়ী হবে'–এই স্লোগান দিতে শুনা গেছে।

উল্লেখ্য, মিছিলগুলোতে সমাজতন্ত্র থেকে আধুনিকতা ও ধর্মহীনতার বিরুদ্ধেই বেশী আক্রোশ পরিলক্ষিত হয়েছে।

www.pathagar.com

এছাড়া চলতি মাসের প্রথমদিকে বুরসা শহরে ডানপন্থীদের যে কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়ে গেল, সেখানেও আতাতুর্কের সংস্কার এবং ১৯৫০ সনের বিপ্লবের বিরুদ্ধেও তাদের চরম আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

(Reproduced by "Yageen" july, 1968)

বিষয়টি মুসলিমবিশ্বের চিন্তাশীল ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের জন্য শিক্ষণীয় এবং উপদেশ গ্রহণ করার মত। যাতে রয়েছে বিভিন্ন চিন্তা-গবেষণা ও দৃষ্টিভঙ্গির খোরাক। তাই লেখকের মূল বক্তব্যকে পাঠকদের সামনে হুবহু তুলে ধরা হয়েছে। ইহুদী লেখকের এ বক্তব্যে কেবল যে তুরস্কের সাধারণ জনগণের প্রকৃত মনোভাব ও ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তা নয়। বরং এতে এও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে, মুসলিম বিশ্বের কোন ধরনের আন্দোলনে পশ্চিমা বিশ্বসহ বিশ্বব্যাপী ইসলামের শত্রুরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে এবং কারা শত্রুদের কাছে এসব তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ইসলামীবিশ্ব পশ্চিমা চিন্তা-চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গির যে আগ্রাসনের সম্মুখীন হয় তাতে তুরস্কই সর্বপ্রথম আত্মসমর্পণ করেছিল। খেলাফতে উসমানীয়া এই আগ্রাসন প্রতিরোধে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে ছিল। তাই খেলাফতকেই এদের প্রথম লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হতে হয়েছে। অতঃপর খেলাফতকে বিলুপ্ত করে যখন মোস্তফা কামাল ক্ষমতাসীন হয় তখন থেকেই সে ক্ষমতার বলে চরম অন্যায়ভাবে তুরস্ক থেকে ইসলামী চেতনা ও রীতি-নীতির মূল উৎপাটনের চেষ্টা করেছে। প্রশাসন ও বিচারালয় থেকে ইসলামী বিধি-বিধানকে অপসারণ করে সুইজারল্যান্ডের দেওয়ানী এবং ইটালীর সামরিক আইন আমদানী করে। ধর্মীয় শিক্ষা নিষিদ্ধ করে। সাংবিধানিকভাবে পর্দা প্রথা বিলুপ্ত করে। সহশিক্ষা চালু করে। আরবী অক্ষরের পরিবর্তে ল্যাটিন অক্ষর প্রতিস্থাপন করে। আরবীতে আযান নিষিদ্ধ করে। মোটকথা, তার যাবতীয় শক্তি ও সামর্থ তুরস্কের জনগণকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্বাঙ্গীনভাবে সত্যিকার পশ্চিমা বানানোর পিছনে ব্যয় করেছে। শেষ পর্যন্ত তুর্কী টুপির পরিবর্তে ইংলিশ টুপি না পরার অজুহাতে

www.pathagar.com

সে বেশুমার নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করেছে। আর কতকাল যে এই ইংলিশ টুপি তুরস্ককে যুদ্ধের ময়দানে পরিণত করে রাখবে তা কে জানে?

কামাল আতাতুর্ক হয়ত ভেবেছিল যে, ইংলিশ টুপির দ্বারা তুর্কীদের মাথায় ইংরেজদের ব্রেণ চলে আসবে এবং তুরস্কের মাটি থেকে ইসলামী রীতি-নীতি ও মূল্যবোধ নিশ্চিহ্ন করতে সে যে জোর-জবরদস্তি এবং অমানবিক অন্যায়-অত্যাচার চালিয়েছে এর পেছনেও এ বদ্ধমূল ধারণারই কার্যকারিতা। কিন্তু তার হয়ত জানা ছিল না যে, 'ইসলামের ভাগ্যে এটা একটা তকদীরী আঘাত'।

ইসলামের প্রতি তুর্কীদের অগাধ ভালবাসা ও সম্মাননা তাদের রক্তের কণায় কণায় চির বহমান। যা অল্প কিছু দিনের জন্যে অবদমিত হয়ে পড়েছিল। তাই বলে একেবারে মুছে ফেলা যায়নি। তুরস্কের যুব প্রজন্মের কাছে যখন আতাতুর্কের অমরত্বের প্রচণ্ড প্রভাব এবং বহির্বিশ্বও পুরোপুরি ধরে নিয়েছিল যে, সেখানে ইসলামের রীতি-নীতির কোন নাম-নিশান আর বাকি নেই, ইসলামের সবকিছু নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে, ঠিক তখনও মজলুম ও নিপীড়িত তুরস্কের সাধারণ জনগণের মধ্যে ধর্মীয় প্রেরণা এবং ইসলামের প্রতি তাদের একান্ত আগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছে। যারা তুরস্কের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত ছিল তাদের এটা অজানা ছিল না। যেমন তুরস্কের প্রখ্যাত মহিলা সাহিত্যিকি খালেদা আদীব খানম (যে নিজেও এক সময় অতি আধুনিকপন্থী নারী লেখিকা ছিল)। ১৯৩৫ সনের দিকে তার (Conflict of East Western Turky) নামক গ্রন্থে লিখেছেন–

> "বর্তমান তুরস্কের বাহ্যিক অবস্থায় মনে হয় প্রতীচ্যের বিজয় পতাকা উড়ছে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে মানুষের অন্তরে এখনও প্রাচ্যের মজবুত ভিত রয়ে গেছে, যা ভিতরে ভিতরে রক্ত সঞ্চালনের মত প্রবাহমান।"

(২য় সংস্কার ১৯৬৩, পৃষ্ঠা-২০২)

'ভিতরে ভিতরে চিরবহমান' ভাবধারা আস্তে আস্তে আত্মপ্রকাশ করছে। ফলে ১৯৫০ সনের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে কামাল আতাতুর্ক এবং ইসমত

www.pathagar.com

আনুনুর দল ব্যাপক পরাজয়বরণ করেছিল এবং সেখানে আদনান মিন্দ্রিসের ডেমোক্রেটিক পার্টি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে ক্ষমতাসীন হয়েছিল। সে একেক করে ইসলাম বিরোধী যাবতীয় আইন-কানুন বাতিল করছিল। ইতোমধ্যে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ডেমোক্রেটিক পার্টিকে অপসারণ করে ইসমত আনুনুর রিপাবলিকান পার্টি জবরদস্তিমূলক অল্পকিছু সময় দেশের শাসনভার নিয়ন্ত্রণ করে এবং সে আদনান মিন্দ্রিসের মত জনপ্রিয় নেতাকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দেয়। কিন্তু এখন আবার সেখানে জাস্টিজ পার্টির মত দল ক্ষমতাসীন। যারা আদনান মিন্দ্রিসের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সাধারণ জনগণের অব্যক্ত মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে চলছে।

বর্তমান রাষ্ট্রপতি গত ঈদুল আযহা উপলক্ষে দেশবাসীর উদ্দেশে এক বাণীতে বলেছেন,

> "যাবতীয় ইসলামবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভ্রান্ত আন্দোলন থেকে আমাদের মুখ ফিরিয়ে নেয়ার সময় এসেছে। ইসলামই একমাত্র সত্যধর্ম এবং পবিত্র আল-কোরআনই মুসলিম উম্মাহর একমাত্র সংবিধান। বর্তমান অবস্থা আমাদেরকে বাধ্য করছে আল-কোরআনকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করতে। আল্লাহর ফজলে তুরস্কের জনগণ ইসলামের সত্যিকার দাওয়াতের পূর্ণাঙ্গতা হেফাজত করার যোগ্যতা রাখে।" (দৈনিক আল-বিলাদ, ২০ যিলহজ্ব ১৩৮৭ হি.)

কিছুদিন পূর্বে তুরস্কের একজন প্রখ্যাত আলেমে-দীন দারুল উলূম করাচী সফরে এসেছিলেন। তিনি বললেন, যে দেশে এক সময় কামাল আতাতুর্ক আলেমদের মাথার উপর পবিত্র কোরআন রেখে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করেছে, করেছে হত্যা– সেখানে আজ কোরআন ও হাদীস শিক্ষার জন্যে হাজার সংখ্যক মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এমনকি নতুন প্রজন্মের যেসব যুবক জিয়া গোকুলপের লেখায় মারাত্মকভাবে প্রভাবিত ছিল তারাও আজ অনুভব করছে যে স্বজনপ্রীতির নামে তাদের সাথে কত বড় ধোঁকাবাজি না করা হয়েছে!

www.pathagar.com

তুরস্কের পরিবর্তিত অবস্থা যেমন আমাদের জন্যে আনন্দের বার্তা বহন করছে, দেখিয়েছে আশার আলো– ঠিক তেমনি আহ্বান করছে আমাদেরকে নিজেদের কর্মপদ্ধতি নির্ধারণের লক্ষ্যে গভীর চিন্তা-ভাবনা করতে। তুরস্ক হচ্ছে মুসলিমবিশ্বের প্রথম অভিজ্ঞতালব্ধ দেশ, যেখানে পশ্চিমা চিন্তা-ধারার আগ্রাসনের হিংস্র থাবা সর্বপ্রথম আঘাত হেনেছিল। চিন্তার জগতে পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গির পথপ্রদর্শক হচ্ছে জিয়া গোকুল্প। আর রাজনৈতিকভাবে তা বাস্তবায়িত হয়েছে কামাল আতাতুর্কের মত এক স্বৈরাচারী রাষ্ট্র নায়কের হাতে। সে দেশের জনগণের উপর পাশ্চাত্যের বর্বর আধুনিকতা চাপিয়ে দিতে এহেন জোর-জুলুম নেই যা তাদের উপর করা হয়নি। দেশটি যেহেতু সমগ্র মুসলিমবিশ্বের জন্যে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রেরণার কেন্দ্রীয় ভূমিকায় ছিল এবং অন্যদিকে ভৌগোলিকভাবে ইউরোপ ঘেঁষা, তাই পশ্চিমারা সেখানে আধুনিকতার ঝড় সৃষ্টিতে কোন প্রকার কসুর করেনি। অবশেষে দেশটিতে প্রায় ত্রিশ বছর পর্যন্ত ইসলামের যাবতীয় রীতি-নীতি ও নাম-ঠিকানা নিশ্চিহ্ন করার সকল ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রফেসর টয়েনবির মতে–

> "হিটলারের সমসাময়িক মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক এক অসাধারণ পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল। তুরস্কের এই একনায়কের ইচ্ছা ছিল তার স্বদেশী লোকজনের মন-মানসিকতাকে জোরপূর্বকভাবে পশ্চিমা সভ্যতায় গড়ে তোলা। আর তাই সে পুরাতন বই-পুস্তক ধ্বংস না করে অক্ষর পরিবর্তনের বিরাট কাজ করে বসে। ফলে বই পুস্তক আর ধ্বংসের প্রয়োজন পড়ল না। কারণ যে অক্ষরগুলো বই-পুস্তকের জন্য চাবির কাজ করে সেগুলোই তো ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। এখন এসব জ্ঞানভাণ্ডার আলমিরার ভিতরে নিশ্চুপ পড়ে থাকবে। কিছু বয়স্কপণ্ডিত আলেম-ওলামা ছাড়া এগুলোতে হাত দেবার মত এখন আর কেউ নেই।"

(ইসলামিয়াত আওর মাগরিবিয়্যাত, মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী, পৃষ্ঠা- ৬৭)

www.pathagar.com

এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে সেখানে দীর্ঘ একটা সময় পর্যন্ত ইসলামপন্থীদেরকে মাঠ-ময়দান থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। এমনকি কয়েক বছর পর্যন্ত সেখানে আধুনিকপন্থীদের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল এবং এদের অবজ্ঞা ও বিরোধিতা করার কারও সাহস ছিল না।

এবার প্রশ্ন হচ্ছে, এই দীর্ঘ সময়ে আধুনিকপন্থীদের একচ্ছত্র আধিপত্য তুরস্ককে কি দিয়েছে? সে দেশের জনগণকে কি পূর্বের তুলনায় বেশী শান্তি ও নিরাপত্তা দিতে পেরেছে? তৈরী করতে পেরেছে কোন উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক, না সৃষ্টি করতে পেরেছে গবেষণা ও দর্শনসহ অন্য কোন বিষয়ে নতুন কিছু উদ্ভাবকতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের? না এমন কোন চিন্তাবিদ ও গবেষকের জন্ম হয়েছে, যে বর্তমান সভ্যতার উল্লেখযোগ্য কিছু সংযোজন করতে পারে? না এমন কোন বলিষ্ঠ নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটেছে, যে সাইপ্রাস সমস্যার সমাধান দিতে পারে? না দিতে পারে তুরস্ককে বিশ্ব দরবারে সম্মানজনক স্থান? সব থেকে বড় কথা হচ্ছে, যে দেশ এক সময় বিশ্বের এক তৃতীয়াংশের উপর মহাদর্পে শাসন করেছে তাদের সেই পূর্বকার রাজনৈতিক সম্মান, আন্তর্জাতিক অবস্থান এবং ইসলামীবিশ্বে নেতৃত্বের মহান দায়িত্বের কোন বিনিময় কি তারা পেয়েছে?

এসব প্রশ্নের উত্তর হবে নেতিবাচক এবং নিশ্চিন্তে না সূচক। এই অবস্থায় এছাড়াও একটি ফল বের হয়। আর তা হচ্ছে, জীবনের মৌলিক সমস্যা সমাধানে ইসলাম ও পাশ্চাত্যের মধ্যকার সমঝোতার যে প্রচারণা আধুনিক চিন্তাবিদরা করছে তা কখনও সম্ভব নয়। তারা মুসলিমবিশ্বকে দৃশ্যমান ক্ষয়-ক্ষতি ছাড়া কিছুই দিতে পারেনি এবং মুসলমানদের প্রকৃত সমস্যাবলী সমাধানে সর্বদাই ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে আসছে। আধুনিকতার দ্বারা সর্বপ্রথম রক্তাক্ত এ তুরস্ক এটাকে আরও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত করেছে যে, যে জাতি নিজেদের স্বকীয়তা-স্বাতন্ত্র্য বর্জন করে নিজের আত্মহননের যাবতীয় আয়োজন করে, অন্যের অন্ধ অনুকরণ করে, সে জাতি কখনও জীবন চলার পথে নিজের পায়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। বস্তুত এমন সম্প্রদায় স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অধিকার রাখতে

www.pathagar.com

পারে না। কারণ সে নিজেই তো এই অধিকার থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেছে।

এই বাস্তবতার অনুধাবন ও জাগরণই আজকে তুরস্কের জনগণ ও শাসকদেরকে জীবন-পদ্ধতি পরিবর্তনে উদ্বুদ্ধ করছে এবং প্রকৃত ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করছে। তাই তুরস্কের এই নবজাগরণ যে কোন বাস্তববাদী লোকের কাছেই আনন্দদায়ক। এসব খবরা-খবর মুসলিমবিশ্বের জন্য যতটুকু খুশির ও আনন্দের বাকি গোটা অমুসলিমবিশ্ব বিশেষত পশ্চিমাবিশ্বের জন্যে তা ঠিক ততটুকু বেদনাদায়ক। যার সামান্যতম বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে মিঃ সাম কোহেনের আলোচ্য নিবন্ধে। প্রবন্ধটির মাধ্যমে মুসলিমবিশ্ব ও ইসলাম সম্পর্কে তাদের (পশ্চিমা বিশ্বের) হীন মানসিকতা অনুধাবন করতে পারবে। এছাড়া প্রবন্ধটি যদি সূক্ষভাবে বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে নিশ্চিতভাবে নিম্নোল্লেখিত ফলাফলে উপনীত হওয়া যাবে।

১. লেখক তার প্রবন্ধে একদিকে একথা স্বীকার করেছেন যে, তুরস্কে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ইসলামী পুনর্জাগরণকে সমর্থন করে থাকে। যদ্দরুন আদনান মিন্দ্রিস নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের জন্য ধর্মীয় মূল্যবোধের পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। অন্যদিকে এ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকেই রাষ্ট্রের বিভক্তি এবং প্রজাতন্ত্রের জন্যে হুমকি বলে অভিযুক্ত করেছেন, যা ঐ পাশ্চাত্য মানসিকতার নির্যাস। যারা গণতন্ত্রকে ঈমানের সমতুল্য আখ্যায়িত করে।

২. অতঃপর ১৯৬০ সনের বিপ্লব উল্লেখ-পূর্বক লেখক বর্তমান সরকারকে আদনান মিন্দ্রিসের অনুসারী বলে তার নিজের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। সরকারের প্রতি তার যতসব রাগ ও অভিমানের কারণ হচ্ছে যে, সরকার ইসলামী পুনর্জাগরণবাদীদের সাথে উদারতা প্রকাশ করে চলছে কেন? (অর্থাৎ কেন অন্যায়ভাবে তাদের দমন করা

www.pathagar.com

হচ্ছে না। কারণ ইসলাম দমনে যে কোন অন্যায় তার কাছে গ্রহণীয়)। এই অভিযোগ পশ্চিমাদের পক্ষ থেকেই যারা 'সংঘাত নয়, সমঝোতা', 'আগ্রাসন নয় উদারতা' -এর স্লোগান বিশ্বব্যাপী বিরামহীনভাবে প্রচার করে থাকে।

৩. লেখক তার প্রবন্ধটিতে একটি হৃদয়গ্রাহী বাক্যের অবতারণা ঘটিয়েছেন। আর তা হচ্ছে– কিছু লোক পুনরায় শরয়ী আইন-কানুন চালু করার প্রকাশ্য দাবী জানিয়েছে। প্রবন্ধকারের ভাষায় মনে হচ্ছে, এ দাবী যেন এমন মহাঅপরাধ যা 'প্রকাশ্যভাবে' করা মৌলিক মানবাধিকার পরিপন্থী। এ-ও সেই পশ্চিমা মানসিকতা যাদের কাছে মুক্তচিন্তা বাকস্বাধীনতা ও লেখার স্বাধীনতার গুরুত্ব অপরিসীম।

৪. গভীরভাবে চিন্তা করার মত প্রবন্ধকারের আর একটি বক্তব্য হচ্ছে, 'তারা কমিউনিজম ও বামপন্থীদের ক্রমবর্ধমান জোয়ার প্রতিরোধের নামে ব্যাপক আকারে মিছিল-মিটিং শুরু করে দিয়েছে। এমনকি তারা সবুজ পতাকা হাতে মার্চ করেছে।

লক্ষণীয় ব্যাপার, তুরস্কে সমাজতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান অগ্রযাত্রা প্রবন্ধকারের জন্য কোন পেরেশানির কারণ নয়; বরং সমাজতন্ত্রের অগ্রযাত্রা প্রতিরোধ মিছিলে উত্তোলিত সবুজ পতাকাই তার দুশ্চিন্তার যতসব কারণ। এতে অনুমান করা যেতে পারে যে, বর্তমান পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার জন্য মূল সমস্যা সমাজতন্ত্র নয়, ইসলাম।

৫. আলোচ্য প্রবন্ধটিতে আমাদের দেশীয় আধুনিকপন্থীদের জন্য এক বিরাট চিন্তার খোরাক রয়েছে। এ ধরনের লেখা, প্রবন্ধ ও নিবন্ধ পড়ে তাদের অনুধাবন করা প্রয়োজন যে, আলোচ্য লেখকের মত আরও বহু পশ্চিমা অমুসলিম লোকজন রয়েছে যারা মুসলিমবিশ্বে 'আধুনিকতার'

www.pathagar.com

প্রভাব-প্রতিপত্তিতে যার পর নাই খুশি হয়। কিন্তু কেন? পক্ষান্তরে ইসলামের পুনর্জাগরণে তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। এরই বা কি কারণ? বিষয়টি নিয়ে তারা এই দৃষ্টিভঙ্গিতে চিন্তা-ভাবনা ও বিশ্লেষণ করলে হয়ত তাদের জীবন-পদ্ধতি পরিবর্তনের অনুভূতি জাগতে পারে।*

---

* টিকা: উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক তুরস্কের সাধারণ নির্বাচনে এই নবজাগণের যেন বিস্ফোরণ ঘটেছে। ১৯৯৫ সালে নাজমুদ্দিন আরবাকানের নেতৃত্বাধীন ইসলামিক ওয়েলফেয়ার পার্টি ২১ শতাংশ ভোট পেয়ে মাদারল্যান্ড পার্টির সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠন করে। নাজমুদ্দিন আরবাকান প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় সে দেশের সেনাবাহিনী ক্ষুব্ধ হয়। ইসলামপন্থী প্রধানমন্ত্রী সেনাবাহিনীর সাংবিধানিক ক্ষমতা খর্ব করে তুরস্ককে একটি বিশুদ্ধ ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার আশঙ্কায় সেনাবাহিনী আরবাকানের দায়িত্ব পালনে বাধা সৃষ্টি করতে থাকে এবং এক বছর যেতে না যেতে সেনাবাহিনী কর্তৃক আরবাকান ক্ষমতাচ্যুত হন। শুরু হয় ইসলামপন্থীদের ধরপাকড়। নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় ইসলামিক ওয়েলফেয়ার পার্টি। প্রধানমন্ত্রী আরবাকানকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য অযোগ্য ও নিষিদ্ধ করা হয়। এ পর্যায়ে ইসলামিক ওয়েলফেয়ার পার্টি নতুনরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ধর্মনিরপেক্ষতা বাদীদের চক্রান্ত থেকে আত্মরক্ষার জন্য তারা ভার্চু পার্টি নামে নতুন দল গঠন করে। অতঃপর ১৯৯৯ সালের ১৮ এপ্রিলের সাধারণ নির্বাচনে ভার্চু পার্টি ১৫ দশমিক ৪ শতাংশ ভোট পেয়ে পার্লামেন্টে তৃতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু ২০০১ সালের ২২ জুন তুরস্কের সাংবিধানিক আদালত ভার্চু পার্টিকেও নিষিদ্ধ করে।

পরবর্তীতে এ দলের লোকজনই ইসলামী জাস্টিজ এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি গঠন করে। তুরস্কের রাজনীতিতে একিপি নামে পরিচিত ইসলামপন্থী এ দলটির উত্থান ধুমকেতুর মত হয়েছে। প্রতিষ্ঠার মাত্র ১১ মাসের মাথায় দলটি সেদেশের বৃহত্তম একটি রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। প্রদত্ত ভোটের ৩৪ দশমিক ২ শতাংশ ভোট পেয়ে ৫৫০ আসনের পার্লামেন্টে ৩৬২ টি আসন পেয়েছে। সরকার গঠন করতে মূলত ২৭৫ টি আসনের প্রয়োজন। কিন্তু তার চেয়েও অনেক বেশী আসন অর্জনে দলটি সক্ষম হয়।

একিপি এত দ্রুত এত জনপ্রিয়তা অর্জন করবে এবং নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে বলে কারো ধারণার মধ্যেই ছিল না। কিন্তু তুরস্কের সাধারণ জনগণের মনে ইসলামী শাসন পুনঃপ্রবর্তনের যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা দীর্ঘদিন যাবত দমিয়ে রাখা হয়েছিল, এ নির্বাচনে এরই বিস্ফোরণ ঘটেছে। নির্বাচনের এ ফলাফল শুধু ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিকপন্থী অপশক্তির পরাজয় নয়; বরং তা এ অঞ্চলে পশ্চিমা স্বার্থ, নীতি ও সভ্যতার প্রতি একটি গুরুতর চ্যালেঞ্জ।

www.pathagar.com

বায়তুল মুকাদ্দাসের পতনের কারণ

আরবরা আজ ইসরাইলের কাছে পরাজিত। তারা ইসরাইলের আগ্রাসন থেকে অধিকৃত ফিলিস্তিন মুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিল। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আরও ২৪ (চব্বিশ) হাজার বর্গমাইল এলাকা ছেড়ে দিতে হয়েছে। বায়তুল মুকাদ্দাস আমাদের প্রথম কেবলা। আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হল 'মসজিদে আকসা' যেখানে দিনে পাঁচবার সুমধুর কণ্ঠে আযানের ধ্বনি শুনা যেত, তা আজ একেবারে নীরব-নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। প্রায় এক লক্ষ নবী রাসূল (আ.)-এর পবিত্র নিঃশ্বাসে এখনও সুরভিত। আজ সেই পুণ্যভূমি এমন এক অশুভ জাতির শিকারে পরিণত হয়েছে, যাদের ভাষায় শান্তি, নিরাপত্তা, ইনসাফ, সৎ চরিত্র ও ভদ্রতা বলে কোন শব্দ নেই। সিনাই উপত্যকা যা এক সময়ে ইহুদীদের জন্য 'তীহ' ময়দান ছিল। সেখানে আজ ইসরাইলের বিজয় পতাকা উড্ডীন। 'তুর পর্বত' যেখানে আল্লাহ পাকের দ্যুতি ও নূর প্রদর্শিত হয়েছিল আজ সেখানে নাজমে ইয়াহুদ বা ইহুদী নিশানার উন্মাদনা। সিরিয়া, জর্ডান ও বায়তুল মুকাদ্দাসের ঐসব অঞ্চল, যেগুলিকে পবিত্র আল-কোরআনে 'আরদে মোবারাকাহ' এবং আরদে মুকাদ্দাসা' অর্থাৎ পুণ্যভুমি নামে উল্লেখ করেছে। আজ সেই 'পুণ্যভূমি' বা 'আরদে মোবারক' কোরআন বিশ্বাসীদের রক্তে রঞ্জিত। সেখানে আজ বর্বরতা ও পাশবিকতার নতুন এক ইতিহাস রচিত হচ্ছে। মুসলমানদের রক্তে হুলি খেলা হচ্ছে। তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হচ্ছে। তাদের ইজ্জত-আবরু আজ ভূলুণ্ঠিত। মানবতা নিষ্পেষিত। অথচ জেনেভা চুক্তি এই অত্যাচার নির্যাতনের ইন্ধন যোগান দিচ্ছে।

বর্তমান ইসলামীবিশ্বের জন্য যা সব থেকে বড় দুঃখ ও মর্মান্তিক ঘটনা, যার জন্য প্রতিটি মুসলমানের অন্তর অস্থির, চোখে পানি। তাই আমাদের স্পষ্টভাবে স্বীকার করতে হবে যে, এটা এমন এক বিরাট পরাজয় ও মহাবিপর্যয় ইসলামী ইতিহাসে যার কোন দৃষ্টান্ত নেই। মাত্র আশি ঘণ্টায় বিভিন্ন আরব দেশের সমস্ত শক্তি ধ্বংস হয়ে গেল। আট হাজার বর্গমাইলের

www.pathagar.com

বসতি লোকজন চব্বিশ হাজার বর্গমাইল বিজয় করে নিল। আট শত বছর পর 'বায়তুল মুকাদ্দাস' থেকে হাত গুটিয়ে নেয়া সহজে ভুলে যাবার মত কোন আঘাত নয়; বরং তা ততক্ষণ পর্যন্ত যন্ত্রণা দিতে থাকবে যতক্ষণ না কোন সালাহ উদ্দীন আইয়ুবী উপশমের ব্যবস্থা করবে।

আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস, পৃথিবীতে কোন ঘটনাই বিনা কারণে সংঘটিত হয় না। প্রত্যেক ঘটনার নেপথ্যেই বাহ্যিক বিভিন্ন কারণের বিরাট এক ধারাবাহিকতা রয়েছে। এছাড়াও আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, প্রত্যেকটি ঘটনাই সতর্ক ও উপদেশের মহা শিক্ষাবার্তা নিয়ে আসে। প্রতিটি দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় মানবীয় অসতর্কতা দূর করতে, সজাগ করতে। জীবনের পিচ্ছিল পথে ঐ ব্যক্তি ও জাতিই উন্নতি ঘটাতে পারবে যাদের সমস্ত ঘাত-প্রতিঘাত প্রতিহত করার ও সামলানোর নিপুণ কৌশল আত্মস্থ থাকবে এবং পরাজয়কে যে দৈবাৎ ঘটনা বা হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোন কিছু মনে না করে নিজের অপরিপক্ব কার্যক্রমের স্বাভাবিক ফল মনে করবে।

অতএব, মর্মান্তিক দুর্ঘটনাগুলোতে কেবল দুঃখ ও উদ্বেগ প্রকাশ করলেই হবে না, ঐতিহাসিক এ মহাপরাজয় আমাদেরকে কিছু অনুধাবন করার, শিক্ষা গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছে।

ইসরাইলের সাথে এই যুদ্ধে আরবরা মারাত্মকভাবে পরাজয়বরণ করে চলেছে। কিন্তু ভয়ঙ্কর এ পরাজয়কে যদি আল্লাহর কুদরতী মার হিসাবে দৃঢ়ভাবে সাব্যস্ত করে কিছু লাভজনক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে তাহলে এ পরাজয়ই মহাবিজয় হিসেবে পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। চোখের পানিতে আত্মহননের সময় এখন নয়; বরং এখন ইচ্ছা ও প্রতিজ্ঞাকে সক্রিয় ও দৃঢ় করার সময়। নিজেদের অপরিণামদর্শিতা ও অবহেলার বদলা নেয়ার সময়। যে কারণে এমন লজ্জাজনক পরাজয় আমাদেরকে দেখতে হল। আসুন আজকের বৈঠকে সব কারণ ও ফলাফলের উপর গভীর চিন্তা-ভাবনা করি। এ বিপর্যয়ের সময়ে তাদের ঐসব ভুল-ত্রুটিগুলোকে চর্চা ও উল্লেখ করা সহমর্মিতা, সমবেদনা প্রকাশের দৃষ্টিকোণ থেকে মোটেও ঠিক হবে না। কিন্তু আমাদের কাছে এরচেয়ে কল্যাণকর কোনকিছু নেই; বরং তাদের সেই

www.pathagar.com

ভুল-ত্রুটিগুলো ধরিয়ে না দেয়া সত্যিকার কোন হিতাকাঙ্ক্ষীর কাজ হবে না। মুসলিমবিশ্বের সামগ্রিক উন্নতি ও মঙ্গলের জন্য এই মুহূর্তে এসব ভুল-ত্রুটিগুলোকে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। তাই সামনের কয়েক পৃষ্ঠার আলোচনার জন্য আমি পূর্বেই উযর পেশ করে রাখছি। আর যেহেতু এই তিক্ত শব্দ চয়ণকারী কেবলই একজন হিতাকাঙ্ক্ষী, তাই আশা করব এসব ভ্রাতৃত্বসুলভ অভিযোগ সুস্থ মন ও বিবেক দিয়ে উপলব্ধি করবেন।

কোরআন, হাদীস ও মানব ইতিহাসের প্রতি গভীর চিন্তা করলে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হবে যে, কোন জাতিই শুধুমাত্র আসমানী শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার জন্মাধিকার দিয়ে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারেনি। শুরু থেকেই আল্লাহ পাক চেষ্টা সাধনা অনুযায়ী অংশ দেয়ার রেওয়াজ চালিয়ে আসছেন। মুসলমানরাও কুদরতের এই অমোঘ বিধানের বাইরে নয়। নিঃসন্দেহে 'শ্রেষ্ঠ জাতি' বলে তাদেরকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে এবং মুসলমানরা সন্দেহাতীতভাবে আল্লাহ পাকের কাছে সর্বাধিক প্রিয় জাতি। একথাও অনিস্বীকার্য যে, মুসলমানদের ধর্মের সাথে তুলনা করার মত কোন ধর্ম পৃথিবীতে নেই। কিন্তু এত কিছুর পরও শুধু মুখে মুসলমানিত্বের দাবী করে হাত-পা গুটিয়ে রেখে এবং বিনা উপায়-উপকরণে যেমন মঙ্গলগ্রহে যাওয়া সম্ভব নয়, তেমনি বিনা চেষ্টায় ইসরাইলের সাথেও বিজয় সম্ভব নয়। সম্ভব নয় উন্নতি ও সফলতা অর্জন।

পবিত্র আল কোরআন ও ইসলামী ইতিহাস অধ্যয়ন ও গবেষণায় একথা অনুধাবন করা যায় এবং প্রতীয়মান হয় যে, মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্বের সকল প্রতিজ্ঞা দু'টি শর্তের উপর নির্ভর।

এক. সত্যিকার মুসলমান হয়ে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের আনুগত্য করা।

দুই. উন্নতির বাহ্যিক উপায়-উপকরণ সমন্বিতকরণ।

এ দু'টি বিষয়ের মধ্যে নিহিত রয়েছে আমাদের উন্নতি, শ্রেষ্ঠত্ব ও সফলতার গূঢ় রহস্য। এ প্রসঙ্গে পবিত্র আল কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

www.pathagar.com

وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين.

অর্থ: "তোমরাই হবে শ্রেষ্ঠ ও বিজয়ী, যদি তোমরা মুমিন হও।"

(সূরায়ে আলে ইমরান, আয়াত-১৩২)

আরও ইরশাদ হচ্ছে–

واعدوالهم مااستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدوالله وعدوكم واخرين من دونهم.

অর্থ: "আর তোমাদের শক্তি-সামর্থ অনুযায়ী পালিত ঘোড়াসহ যা কিছু সংগ্রহ করতে পার তা ওদের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত কর। যেন আল্লাহ ও তোমাদের শত্রুদের উপর এর প্রভাব পড়ে।" (সূরায়ে আনফাল, আয়াত-৬০)

ইসলামী ইতিহাসের যে কোন বিপ্লবের প্রতিই দৃষ্টি দেন, কোরআনের এই বাণীর সত্যতা যথার্থ পাওয়া যাবে। যেখানেই মুসলমানরা সত্যিকার মুসলমান হয়ে বাহ্যিক উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করে যথাসম্ভব চেষ্টা করেছে সেখানে শত্রুর তুলনায় অনেক দুর্বল ও কম হলেও তারাই বিজয়ী হয়েছে। আর যখনই তারা এ দু'টি নির্দেশের কোন একটি পালনে অবজ্ঞা করেছে, তখনই পরাজয়ের গ্লানি তাদেরকে বহন করতে হয়েছে।

(দৈনিক ইনকিলাব : ১৮/৪/০২ইং)

বায়তুল মুকাদ্দাসের ইতিহাস

বায়তুল মুকাদ্দাসের ইতিহাসের প্রতি লক্ষ করলেই এই দাবীর সত্যতা পাওয়া যাবে। হযরত সুলাইমান (আ.) সর্বপ্রথম 'বায়তুল মুকাদ্দাস' নির্মাণ করেছিলেন এবং সে সময়কার মুসলমানগণ তারই অনুসারী ছিল। যতদিন পর্যন্ত তারা সততা, কল্যাণ ও মঙ্গলের পথে চেষ্টা-প্রচেষ্টা করেছে, ততদিন পর্যন্ত শুধু 'বায়তুল মুকাদ্দাস' নয়, ইয়ামনসহ সমগ্র হেযাজে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ছিল। রোম উপসাগরের পূর্বপ্রান্ত থেকে নিয়ে আফ্রিকার পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত তাদের একক কর্তৃত্বও ছিল। কিন্তু হযরত সুলাইমান (আ.)-এর পর তার ছেলে রাহবে আম যখন মসনদে সমাসীন হয়ে ক্ষমতার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে

www.pathagar.com

পিতার যাবতীয় রীতি-নীতি পিছনে ঠেলে দিল, অবজ্ঞা করে বসল– যার তাৎক্ষণিক ফলাফল দাঁড়াল যে, ইয়ারবে আম নামক হযরত সুলাইমান (আ.)-এর এক অনুচর কেন্দ্রের প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করে উত্তরে 'ইসরাইল' নামে নতুন এক রাজত্ব কায়েম করে বসে। ফলে তখনকার মুসলমান বনী ইসরাইল এই দুই দেশ ও শাসনে বিভক্ত হয়ে পড়ল। উত্তরে ছিল ইসরাইলী সাম্রাজ্য। সামেরাহ, বর্তমান নাবলুসে ছিল যার রাজধানী। দক্ষিণে ছিল 'ইহুদিয়াহ' সাম্রাজ্য। জেরুজালেম (বায়তুল মুকাদ্দাস) ছিল এর রাজধানী। তাদের অনৈক্য ও বিভক্তির অত্যাবশ্যকীয় ফলাফল হল, বনী ইসরাইলের 'সাবা' সম্প্রদায়ের প্রায় সমতুল্য, যে সামরিক শক্তি ছিল তা পরস্পরের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধে ব্যয় হতে লাগল। এই ইহুদিয়াহ ও ইসরাইলী সাম্রাজ্য শত শত বছর একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত রইল।

বনী ইসরাইলের ইতিহাসে খৃষ্টপূর্ব ৯৩৭ সাল থেকে খৃষ্টপূর্ব ৫৮৬ সাল পর্যন্ত সময়টা এ অন্তর্ঘাতমূলক গৃহযুদ্ধের হৃদয়বিদারক উপাখ্যান। অনেক সময় এক এক যুদ্ধে পাঁচ লক্ষের মত বনী ইসরাইলী নিহত হয়েছে। কিন্তু তারপরও ক্ষমতাসীনদের রেশারেশি, দড়ি টানা-টানি বন্ধ হয়নি। অন্যদিকে বনী ইসরাইলের লোকজন তাদের পূর্বপুরুষদের সত্যধর্ম ও দীন ভুলে মূর্তিপূজা, নক্ষত্র-পূজায় লিপ্ত হয়ে গেছে। তারা আরাম-আয়েশে মত্ত হয়ে গেল। যাজকগণ অপ্রয়োজনীয় ও মিথ্যা ধর্মীয় মতভেদ ও অনৈক্য সৃষ্টিতে সার্বক্ষণিক ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এই দীর্ঘ সময়ে আল্লাহ পাক তাদের মাঝে অনেক বড় বড় নবী রাসূল (আ.) কে হেদায়তের আলো দিয়ে প্রেরণ করলেন। কিন্তু অল্প সময় ছাড়া বাকী পুরো সময়টাই তাদের অসৎ আচরণ ও ভোগ-বিলাসিতায় অতিবাহিত হয়েছে।

প্রকৃতি কখনও কোন জাতির জন্য হঠাৎ করে বা এক নিমিষেই ধ্বংসযজ্ঞ নিয়ে আসে না; বরং পূর্ব থেকেই তাকে বিভিন্নভাবে সংকেত দেয়। ঠিক এ ধরনের পরিস্থিতিতে নবী রাসূল (আ.) প্রেরণ ছাড়াও বনী ইসরাইলদেরকে সতর্ক করার জন্য অল্প স্বল্প কষাঘাতও করা হয়েছে। কিছুদিন পর পর বহির্শক্তি তাদের উপর হামলা করে রাষ্ট্রসীমা সংকুচিত করে দিত, বিভিন্ন এলাকা দখল করে বসত। এমনকি জেরুজালেম পর্যন্ত পৌঁছে যেত। কিন্তু

www.pathagar.com

এ জাতীয় সমস্ত আক্রমণ বিক্ষিপ্তভাবে আংশিক ক্ষতিসাধন করে ফিরে চলে যেত। বনী ইসরাইলরা লক্ষ করছিল যে, বহির্শত্রু ধারাবাহিকভাবে তাদের সামরিকশক্তি বৃদ্ধি করে চলেছে। তবুও তাদের চোখ খোলেনি। ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েশ ছেড়ে কর্মচঞ্চল হওয়া তাদের স্বভাব বিরোধী হয়ে গিয়েছিল।

হযরত আরমিয়াহ (আ.), হযরত শুয়াইব (আ.), হযরত হিযকিল (আ.) ধারাবাহিকভাবে একজনের পর একজন বনী ইসরাইলকে সতর্ক করেছেন। আল্লাহর ওয়াস্তে সংশোধন হয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। আরও বলেছেন যে, ব্যাবিলনের রাজা চারদিক থেকে তোমাদেরকে ঘিরে ফেলেছে, অতএব এখন যদি তোমাদের হুশ না আসে, সচেতনতা না আসে তবে তোমাদের নাম-নিশানা পর্যন্ত মুছে যাবে। কিন্তু গান-বাজনা ও অশ্লীলতায় মত্ত লোকজন ধরে নিয়েছিল যে তারা ব্যাবিলনের আক্রমণ থেকে নিরাপদ হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে ইহুদী যাজকদের বিশ্বাস ছিল, তারা আল্লাহর সর্বাধিক প্রিয় জাতি। সুতরাং শত্রুর মোকাবিলায় তাদের হাত-পা নাড়তে হবে না। শত্রু যখনই জেরুজালেম অভিমুখী হবে তখনই আকাশ থেকে তাদের উপর অদৃশ্য শক্তি কর্তৃক বিদ্যুত বর্ষণ করে ধ্বংস করে দেবে।

ঠিক এমনি অবস্থায় শাসকগণ ভোগ-বিলাসে ব্যস্ত। যাজকগণ একটি সুইয়ের ছিদ্রে অবস্থানরত ফেরেশতার সংখ্যা নির্ণয়ের বিতর্কে লিপ্ত। তখনই ব্যাবিলনের প্রভাবশালী রাজা বুখতে নসর আল্লাহর গযব হিসেবে তাদের উপর আবর্তিত হয়। সে জেরুজালেম ও এর আশপাশ এলাকা থেকে বনী ইসরাইলীদের একেবারে মূল উৎপাটন করে ফেলল। যার সৈন্য-সামন্ত ও আক্রমণের ধরন ঘূর্ণিঝড়ের মত ছিল। যা বনী ইসরাইলের যাবতীয় বাধা ও প্রতিরোধব্যূহকে ধ্বংস করে ইহুদী সাম্রাজ্যকে একেবারে ধুলোর সাথে মিশিয়ে দিয়েছিল এবং জুলুম-নির্যাতনের এমন এমন নতুন কায়দা-পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিল যার কল্পনায়ও লোম শিহরিয়ে উঠে। রাজার সামনেই তার ছেলেকে হত্যা করা হল। রাজাসহ অন্য ইহুদী নেতৃবৃন্দকে ব্যাবিলনে নিয়ে যাওয়া হল এবং পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত বুখতে নসরের গোলামী করে অপমান জনকভাবে তার জীবন অতিবাহিত করতে হল।

www.pathagar.com

মহাগ্রন্থ আল কোরআনে সূরায়ে বনী ইসরাইলে এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হচ্ছে–

بعثنا عليكم عبادا لنا او لى بأس شديد فجاسوا خلل الديار وكان وعدا مفعولا

অর্থ: তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কঠোর যোদ্ধা বান্দাদেরকে প্রেরণ করলাম। ফলে তারা প্রতিটি জনপদের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ল। বস্তুত এ ওয়াদা পূর্ণ হওয়ারই ছিল। (সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত-৫)

এই মহাবিপর্যয়ে বনী ইসরাইলের কিছুটা ঘুম ভাঙ্গল। তাদের দাসত্বের জীবন পূর্বকার জীবন থেকে পর্যাপ্ত পরিচ্ছন্ন-মার্জিত ও পূত-পবিত্র হল। অন্তর্কলহ হ্রাস পেল এবং সবাই অনুশোচনা প্রকাশ করত এ দুর্যোগ থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহপাকের কাছে দুআ করল। আল্লাহপাক তাদেরকে আবার সুযোগ দিলেন। খৃষ্টপূর্ব ৫৩৬ সালে পারস্য সম্রাট খসরু ব্যাবিলন আক্রমণ করে তা করতলগত করে নেয়। অতঃপর সম্রাটের দয়ায় বনী ইসরাইলীরা আবার ফিলিস্তিনে আবাদী গড়ে বসবাস করার অনুমতি পেল এবং খৃষ্টপূর্ব ৫১৫ সালে পারস্য সম্রাটের অনুমতি সাপেক্ষে ও সহযোগিতায় বায়তুল মুকাদ্দাস পুনর্নির্মিত হয়। বনী ইসরাইল তখন হযরত উযাইর (আ.)-এর উপস্থিতিতে আল্লাহপাকের কাছে অতীতের যাবতীয় পাপ ও অবাধ্যতার জন্য তওবা করে খোদায়ী বিধি-বিধান মতে জীবন অতিবাহিত করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। বেশ কিছু দিন পর্যন্ত তারা অঙ্গীকারের প্রতি অটল ছিল। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে আবার স্বেচ্ছাচারিতা ও অবাধ্যতা ফিরতে লাগল। উল্লেখ্য, এর পূর্বে বনী ইসরাইলের যদিও শাসন ক্ষমতা অর্জন হয়নি, কিন্তু অঢেল ধন-সম্পদ, পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা তারা ভোগ করেছিল। ফিরে পেয়েছিল আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাসের ও সুখ স্বাচ্ছন্দের জীবন-ধারা।

পবিত্র কোরআন তাদের এই নবজীবনের আলোচনা এভাবে করেছে–

ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلنكم اكثر نفيرا.

www.pathagar.com

অর্থ: "অতঃপর আমি তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে নালা ঘুরিয়ে দিলাম। তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও পুত্র সন্তান দ্বারা সাহায্য করলাম এবং জনসংখ্যার দিক দিয়ে তোমাদেরকে একটা বিরাট বাহিনীতে পরিণত করলাম।" (সূরায়ে বনী ইসরাইল, আয়াত-৬)

সাথে সাথে আল্লাহপাক তাদেরকে সতর্ক করে ইরশাদ করছেন–

ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اسأتم فلها

অর্থ: "তোমরা যদি ভাল কর, তবে তা নিজের জন্যই ভাল করবে। আর যদি মন্দ কর, তবে তাও নিজেদের জন্যই।" (সূরায়ে বনী ইসরাইল, আয়াত-৭)

কিন্তু তাদের এ সুখ-সাচ্ছন্দের জীবন বেশীদিন স্থায়িত্ব লাভ করেনি। বরং স্বেচ্ছাচারিতা ও প্রবৃত্তির চাহিদা বৃদ্ধি পেল। ফলে 'ভোগ' প্রবৃত্তি এবং মূর্তিপূজা আবার শুরু করতে লাগল। যখন অবসর হওয়ার সুযোগ আসল তখন একে অপরে নতুনভাবে ঝগড়া-ঝাটিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ঠিক এভাবে ধীরে ধীরে বনী ইসরাইল আবার ঐ অবস্থায়ই উপনীত হল, যে অবস্থায় বুখতে নসর আযাব স্বরূপ তাদের উপর আবর্তিত হয়েছিল। এবার ব্যাবিলন সম্রাট বুখতে নসরের স্থলে রোম সম্রাট খৃষ্টপূর্ব ১৬৫ সালে বায়তুল মুকাদ্দাসের উপর হামলা করে দ্বিতীয়বার একে একেবারে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়। তওরাতের সমস্ত কপি পুড়িয়ে ফেলে। এক এক করে বনী ইসরাইলকে হত্যা করা হল। অল্পসংখ্যক লোকজন যারা বেঁচে ছিল এদেরকে নির্বাসিত করা হল।

পবিত্র কোরআন এ ঘটনার আলোচনা এভাবে করেছে–

فاذا جاء وعد الاخرة ليسواء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليتبروا ماعلوا تتبيرا.

অর্থ: "অতঃপর যখন দ্বিতীয় ওয়াদার সময় এল, তখন অন্য বান্দাদেরকে প্রেরণ করলাম। যাতে তোমাদের মুখমণ্ডল বিকৃত করে দেয় এবং মসজিদে ঢুকে পড়ে, যেমন প্রথমবার ঢুকেছিল এবং যেখানেই জয়ী হয়, সেখানেই পুরোপুরি ধ্বংসযজ্ঞ চালায়।" (সূরায়ে বনী ইসরাইল, আয়াত-৭)

www.pathagar.com

এ ছিল ইহুদী জাতির পরবর্তী শাস্তি। উল্লেখ্য, এ ঘটনার প্রায় চারশত বছর পূর্বে শাসন-ক্ষমতা এদের হাত ছাড়া হয়। আর এ যাত্রায় স্থায়ী অপমান এদের ভাগ্যে লিপিবদ্ধ হয়ে গেল। এমনকি পৃথিবীর কোন প্রান্তরেই ঐক্যবদ্ধভাবে মাথা উঁচু করে জীবন-যাপনের সম্ভাবনাও রইল না। এ ঘটনা থেকে আজ পর্যন্ত ২১৩২ (দুই হাজার একশত বত্রিশ) বছর অতিবাহিত হতে লাগল এবং তখন থেকে আজ পর্যন্ত বনী ইসরাইল বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে দূরের এরিয়ার বাইরে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন জীবন-যাপন করছে।

পবিত্র কোরআনে এই হামলার উল্লেখের সাথে সাথে আরও ইরশাদ হচ্ছে–

عسى ربكم ان يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكفرين حصيرا

অর্থ: "তোমাদের প্রভু তোমাদের উপর দয়াপরবশ হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু যদি তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী কৃতকর্মের (পাপের) পুনরাবৃত্তি কর তবে মনে রেখো, আমিও (শাস্তি বা আযাব) পুনরাবৃত্তি করব। জাহান্নামকে আমি কাফেরদের জন্য কয়েদখানা স্বরূপ বানিয়ে রেখেছি।"

(সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত-৮)

অর্থাৎ তোমরা যদি নিজেদেরকে সংশোধন করে নিতে পার তাহলে আল্লাহপাক তোমাদের প্রতি দয়া ও রহমত করবেন। আর এই অনুগ্রহ করার পর যদি তোমরা আবার পূর্বের ন্যায় কুকর্ম ও পাপের পুনরাবৃত্তি কর তাহলে তোমাদের সাথে পূর্বের আচরণই পুনরাবৃত্তি করা হবে। বনী ইসরাইলের প্রতি আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের বহিঃপ্রকাশের ধরন নিম্নরূপ:

ইহুদী জাতির মধ্যে যারা চাল-চলনে আচার-ব্যবহারে আমল-আখলাকে তুলনামূলক অধিকতর ভাল ও শ্রেষ্ঠ ছিল তারা ঈসা (আ.)-এর আবির্ভাবের পর তাঁর প্রতি ঈমান নিয়ে আসে। যাদের মধ্যে একদিকে ইবাদত-বন্দেগীর যথেষ্ট প্রবণতা ছিল, আবার অন্যদিকে কর্মোদ্দীপনা ও উদ্দাম ছিল ব্যাপকভাবে। অতএব হযরত ঈসা (আ.)কে আকাশে উঠিয়ে নিয়ে যাবার পর দীর্ঘ তিন শতাব্দীর চেষ্টা-প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে বনী ইসরাইলের এই উপদল

www.pathagar.com

বিরাট রোম সাম্রাজ্যের অধিকর্তা হতে পেরেছিল এবং বায়তুল মুকাদ্দাসও তাদের নিয়ন্ত্রণে এসেছিল। অতঃপর চার শতাব্দী পর্যন্ত খৃষ্টানরা অত্যন্ত জাকজমকভাবে রোম সাম্রাজ্যের শাসন-ক্ষমতা পরিচালনা করেছে। কিন্তু কালের বিবর্তনে তাদের মধ্যেও ইহুদীদের প্রসিদ্ধ ত্রিশটি বদঅভ্যাসের অনুপ্রবেশ ঘটতে লাগল এবং মূল ধর্মের বিকৃতি শুরু করে দিল।

অবশেষে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আরবের মরুউদ্যানে নবুওয়াতের সমাপনী সূর্য উদ্ভাসিত হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবির্ভূত হয়ে ইহুদ ও নাসারার বিকৃত ধর্মকে মূল আকৃতিতে উপস্থাপন করেন। ফলে মুসলমানরা তওরাত ও ইঞ্জিলের প্রকৃত অনুসারী হিসেবে স্বীকৃতি পেল। ইসলামী ইতিহাসের প্রথমদিকে মুসলমানরা আচার-ব্যবহার, চাল-চলনে, আমল-আখলাকে এক অসাধারণ পবিত্রতার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এবং কর্মস্পৃহা, উদ্দাম ও সাহসিকতার এক উজ্জ্বল নজীর পেশ করে। ফলে অল্পকিছু দিনের মধ্যেই কিসরা ও কায়সারের অহঙ্কার ধুলিস্যাত করে সামনে অগ্রসর হতে লাগল। দেখতে দেখতে সমগ্র বিশ্বব্যাপী ইসলাম বিস্তৃতি লাভ করে। উল্লেখ্য, তাদের সংখ্যা তখন নিতান্ত কম ছিল। শত্রুর তুলনায় উপায়-উপকরণ না থাকারই মত ছিল। এতদসত্ত্বেও তারা ঈমানী পোশাকে সুসজ্জিত এবং ঈমানের বলে বলীয়ান হওয়ার সাথে সাথে চেষ্টা-প্রচেষ্টার ক্ষেত্রেও ছিল তারা ব্যাকুল। ফলে তদানীন্তন অন্যান্য বিশ্বশক্তি তাদের সামনে অনায়াসে মস্তক অবনত করেছে। সেই মুসলিম-সোনালী যুগেই হযরত ওমর (রাযি.) বন্দীর বিনিময়ে খৃষ্টানদের কাছ থেকে বায়তুল মুকাদ্দাসের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন। প্রকৃতপক্ষে মুমিন ও মুজাহিদ হিসেবে মুসলমানরা প্রায় পাঁচ শতাব্দী পর্যন্ত বায়তুল মুকাদ্দাসের উপর শাসন-ক্ষমতা অধিষ্ঠিত রাখে।

অতঃপর বিভিন্ন বিপ্লব প্রতিবিপ্লবের পর বায়তুল মুকাদ্দাসের নিয়ন্ত্রণভার সেলজুক ও তুর্কীদের হাতে ন্যস্ত হয়। তারা ছিল নওমুসলিম। ইসলামের নবচেতনা ও উদ্দীপনায় ছিল তারা ব্যাকুল। কিন্তু ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষায় তখনও পূর্ণতা লাভ করেনি। ফলে তাদের এই আবেগ ও অতিউৎসাহ

www.pathagar.com

অনেকটা ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। যার ফলে তারা খৃষ্টান দর্শনার্থীর জন্য কিছু অতিরিক্ত বাধ্য-বাধকতা ও নিয়মানুবর্তিতা আরোপ করে, যা হযরত ওমর (রাযি.) কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তিতে ছিল না। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে রোমান খৃষ্টানরা এই নব আরোপিত দর্শন-বিধির বিরুদ্ধে ক্রুসেড যুদ্ধের ঢাক-ঢোল শুরু করে দিল। অন্যদিকে মুসলমানদের মধ্যেও তখন প্রকৃতপক্ষেই দুর্বলতা এসেছিল। তাই অল্পকিছু সময়ের জন্যে বায়তুল মুকাদ্দাস তাদের নিয়ন্ত্রণ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে তখনও মুসলমান মুসলমানই ছিল। তাই আল্লাহপাক এই উদ্দেশ্যে সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ূবীকে সামনে নিয়ে আসলেন। যিনি ঈমানের চাহিদা ও দাবী সম্পর্কে ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। তিনি ক্রুসেড যুদ্ধে বার বার খৃষ্টানদের পরাস্ত করে অল্পকিছু সময়ের মধ্যেই বায়তুল মুকাদ্দাস ফেরত নিয়ে আসলেন। ঘটনাটি হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমদিকে সংঘটিত হয়েছিল। আর তখন থেকে আজ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বায়তুল মুকাদ্দাস মুসলমানদের হাতেই ছিল।

এই দীর্ঘ ইতিহাস বর্ণনার দ্বারা এটাই বুঝানো উদ্দেশ্য যে, গত কয়েক মাসে বায়তুল মুকাদ্দাস ও এর আশপাশে যা সংঘটিত হয়েছে তা প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই হয়েছে, যা গত তিন হাজার বছর যাবত চলে আসছে। বনী ইসরাইল যখন আল্লাহর মাহবুব জাতি ছিল তখন তারা বুখতে নসর ও তাইতিস-এর আযাব থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারেনি। আর এখন মুসলমানরা হচ্ছে আল্লাহর প্রিয় জাতি। এর অর্থ এই নয় যে, তাদের মধ্যে যাবতীয় কুকর্ম, বদঅভ্যাস, অসৎ আচরণ ও ভোগ-বিলাসপ্রিয়তা থাকা সত্ত্বেও বিজয়-সফলতা, ইজ্জত-সম্মানের স্থায়ী অধিকার তাদের নিয়ন্ত্রণেই থাকবে। তাই মুসলমানদের অপকর্মের বিনিময়ে ইসরাইলের মত বর্বর ও কমিনা শত্রুকে তাদের উপর বিজয়ী করে দেয়া আশ্চর্যের কিছু নয়।

ইতিহাসের এই দীর্ঘ অধ্যায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বর্তমান যুদ্ধের একটা পর্যালোচনা করলে আরবদের পরাজয়ের পিছনে মূলত দু'টি কারণ পাওয়া যাবে। পবিত্র কোরআনের ভাষ্য অনুযায়ী মুসলমানদের বিজয় ও সফলতা ঐ দু'টি বিষয়ের উপরই নির্ভরশীল।

www.pathagar.com

(১) ঈমানের সেই রূহ বা ত্যাজদীপ্ত শক্তির অনুপস্থিতি। যা انتم الاعلون 'তোমরাই হবে বিজয়ী' এই আয়াতের স্থায়ী সুসংবাদবাহী।

(২) তাদের মধ্যে সেই চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও উদ্দীপনার অভাব ছিল, যে প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

واعدوا لهم مااستطعم من قوة

"তোমরা যথাসম্ভব শক্তি অর্জন করে নাও।"

পরাজয়ের কারণসমূহ

১. আরবদের পরাজয়ের প্রথম মৌলিক কারণ হচ্ছে ইসলামের মূল-শিক্ষার অনুপস্থিতি। বছর কে বছর যাবত তারা দাবী করছে যে তারা পাশ্চাত্য রীতি-নীতি ও সংস্কৃতিকে ঘৃণা করে। কিন্তু তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র ও মুহূর্ত এই দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। তাদের চিন্তা-চেতনা, চলন-বলন, রীতি-নীতি, সভ্যতা-সংস্কৃতি, পোশাক-আশাক, সামাজিকতা-মোদ্দাকথা, মাথা থেকে পা পর্যন্ত সবকিছুই মৌখিকভাবে কেবল পাশ্চাত্য আগ্রাসনবিরোধী। প্রকৃতপক্ষে তাদের অন্তর কিন্তু ঐগুলোই ভালবাসে, পছন্দ করে। পশ্চিমা সংস্কৃতিই তাদের কাছে প্রিয়। ওদের চিন্তাধারাই তাদের কাছে ভাল লাগে। ওদের সামাজিকতাই তাদের মনপূত।

যার ফল হচ্ছে, আপনি যদি কোন আরব দেশে যান তবে একে মুসলিম দেশ হিসেবে চিনতে আপনার জন্যে বিরাট দুরূহ হয়ে দাঁড়াবে। পশ্চিমা যে কোন দেশের মতই সেখানে বেহায়াপনা-অশ্লীলতা, ভোগপ্রিয়তা সর্বোপরি খোদাদ্রোহিতা পাবেন। এমন খবর পাওয়া গেছে যে, হামলার পূর্বে দু'দিন ইসরাইলের সৈন্যরা রোযা রেখেছে। পক্ষান্তরে যখন মিশরের সীমানায় ইসরাইলের যুদ্ধ বিমানগুলো অনুপ্রবেশ করে দিব্যি বোম্বিং করছে তখনও কায়রোর অনেক হোটেলে নৃত্য ও সঙ্গীতের জমজমাট অনুষ্ঠান চলছিল। এই গত কয়েক মাস পূর্ব পর্যন্ত মিশরে যে-ই ইসলামের নাম নিয়েছে তাকেই ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলতে হয়েছে। মিশর ও সিরিয়ার আলেম-ওলামাদের প্রতি জুলুম নির্যাতনের যে স্টিমরুলার পরিচালিত হয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়।

www.pathagar.com

লক্ষণীয় ব্যাপার যে, ইসরাইলে ইহুদী যাজকগণ সাধারণ জনগণকে আরব দেশসমূহের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছে এবং তাদের মধ্যে ধর্মীয় আবেগ-স্পৃহা তৈরি করছে। পক্ষান্তরে মিশর ও সিরিয়ার আলেমদেরকে জেলখানায় বন্দী করে ইসলামপ্রিয়তার শাস্তি দেয়া হচ্ছে।

২. ইসলামী শিক্ষা থেকে দূরত্বের অত্যাবশ্যকীয় ফলাফলই হচ্ছে ইসরাইলকে মোকাবিলা করতে যেয়ে আরব রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক ইসলামের পরিবর্তে আরব জাতীয়তাবাদের স্লোগানে সোচ্চার হল। শত শত বছর যাবত আরবরা এই 'স্বদেশী জাতীয়তাবাদের' ভূত ধারণ করে আসছিল, যা ভাঙ্গতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজের ভাষণে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন :

لافضل لعربى على عجمى

"কোন অনারবের উপর কোন আরবীর শ্রেষ্ঠত্ব নেই।"

অন্যদিকে ইসরাইলে বিভিন্ন বংশের বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের ইহুদীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে সামরিক প্রস্তুতিতে অংশ নিল। সেখানে ইহুদীবাদ ছাড়া অন্যকোন বিষয়বস্তু কাজ করেনি। তাদের ভাষা, বংশ, দেশ, সভ্যতা-সংস্কৃতি সবই ভিন্ন ভিন্ন। তবুও তারা কেবল ধর্মের নামে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। তাদের এই ধর্মীয় ঐক্য ধর্মীয় যুদ্ধের প্রেরণা সৃষ্টি করেছে। আর তাই দেশীয় বা ভৌগোলিক ও আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের উপর ভিত্তি করে এর প্রতিরোধ সম্ভব হয়নি; বরং এর কার্যকর প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজন ছিল ফিলিস্তিন সমস্যাকে শুধু আরবদের সমস্যা মনে না করে সমগ্র ইসলামীবিশ্বের সমস্যা হিসেবে উপস্থাপন করা এবং এ ব্যাপারে ইন্দোনেশিয়া থেকে মরক্কো পর্যন্ত সকল মুসলমানকে সাথে নেয়া বা সবার অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা। ১৯৬৫ সালের আরব-ইসরাইলের যুদ্ধে তুরস্ক, পাকিস্তান, ইরান তাদের পূর্ববর্তী তিক্ততা ভুলে গিয়ে উদারভাবে আরবদের সাহায্য-সহযোগিতায় যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তা এ বক্তব্যের বাস্তবতা প্রমাণের জন্যে যথেষ্ট। আরবরা যদি ফিলিস্তিনের এই সমস্যাকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে সকল মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করত, তাহলে এর সমাধান অনায়াসেই হয়ে যেত। এ

www.pathagar.com

ধরনের কোন মহান বা পবিত্র ঐক্য যদি করাই যেত, তাহলে বিশ্বের মানচিত্র থেকে শুধু ইসরাইলকেই মুছে দেয়া যেত না; বরং কাশ্মীর থেকে সাইপ্রাস পর্যন্ত যাবতীয় মুসলিম সমস্যাদিরও সহসাই সমাধান হয়ে যেত। অপরদিকে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ যারা নিজেদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে কখনও আমেরিকা, কখনও রাশিয়া, কখনও চীনের শরণাপন্ন হচ্ছে, তারা বাইরের শক্তির মুখাপেক্ষিতা ও নির্ভরতা থেকে মুক্তি লাভ করত। পৃথিবীর মানচিত্রের প্রতি লক্ষ করুন! দেখুন প্রকৃতি কত নিপুণভাবে ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামীবিশ্বকে একটি মালার মত গেঁথে রেখেছে। পৃথিবীর কত বড় বড় শহর-বন্দর তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন।

প্রাকৃতিক উপকরণের দিক থেকেও কত সমৃদ্ধশালী। জনবলের দিক থেকেও কত অগ্রসর। গোলাকৃতি ভূপৃষ্ঠের মধ্যস্থলে তাদের অবস্থান হওয়ায় পৃথিবীর একেবারে কলিজাখানা তাদের হাতের মুঠোয়। প্রকৃতির এসব উপঢৌকন ও অবদানকে যদি সম্মিলিতভাবে সুসংগঠিত হয়ে কাজে লাগানো যেত, তবে পৃথিবীর বুকে তাদের যথাযথ স্থান নিতে বা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে কোন কিছুই প্রতিবন্ধক হতে পারত না।

উল্লেখিত বিষয়াদি ছাড়াও যুদ্ধকালীন সময়ে ইসলামের ইজ্জত, আল্লাহ-রাসূলের ইজ্জত রক্ষার পরিবর্তে আরবের ইজ্জত রক্ষার স্লোগান উচ্চারিত হল। যা খোদায়ী গযব ডেকে আনার যাবতীয় আয়োজন বৈ কিছু নয়। ফলে জাতীয়তাবাদের এই চেতনার বিস্তৃতিতে পর পর অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রথমত ইসরাইলের শত্রুতার মোকাবেলায় ছিল না কোন কার্যকর প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রস্তুতি, যাদের পেছনে রয়েছে সমগ্র পশ্চিমাবিশ্বের মদদ। দ্বিতীয়ত জাতীয়তাবাদের কারণে আরবরা নিজেরাই আত্মকলহে ছিল প্রচণ্ডভাবে জর্জরিত। জাতীয়তাবাদের পক্ষের লোকজন ছিল এক ব্লকে। অন্যদিকে জাতীয়তাবাদ বিরোধীরাও পৃথক এক ব্লক তৈরি করেছিল। এবার উভয়পক্ষের মধ্যে শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ-বিগ্রহের দাবানল। যে অপশক্তি উভয়ের জন্যই ভয়ঙ্কর শত্রু তার মোকাবেলার পরিবর্তে পরস্পরের বিরুদ্ধে নিজেদের যাবতীয় শক্তি ব্যয় করতে লাগল। যাবতীয় প্রচার-প্রপাগান্ডার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করল একে অপরকে। এমনকি

www.pathagar.com

ইসরাইলের আকৃতিতে যখন বৃটেন ও আমেরিকা আরব দেশগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, ঠিক তখনও মিশরের উচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পঞ্চাশ হাজার সৈন্য ইয়ামানের অভ্যন্তরে ঢুকে মুসলিম নিধনে নিমগ্ন।

জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণায় তৃতীয় ক্ষতি হচ্ছে, সৈন্যদের ভিতরে জিহাদের রূহ বা চেতনার জাগরণ সৃষ্টি হয়নি, যা মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে দিতে পারত। উল্লেখ্য, মৃত্যুর কামনা ব্যতীত কোন বাহিনীই কোন যুদ্ধে বিজয়ী হতে পারে না। চার দিনের এ যুদ্ধে আরব এবং কায়রোর যৌথ বাহিনীর হাই কমান্ডার রেডিও থেকে ক্রমাগতভাবে–

جاهدوا فى سبيل العروبة

"আর জাতীয়তাবাদের পথে বা পক্ষে জিহাদ কর" –বলে স্লোগান ও আহ্বান দিচ্ছিল।

جاهدوا فى سبيل الله

বা 'আল্লাহর পথে জিহাদ কর' এমন আহ্বান ও স্লোগান শুনার জন্য এ হতভাগার কর্ণদ্বয় সার্বক্ষণিক ওঁৎ পেতেছিল। العز للعرب। আরবের সম্মান রক্ষার আহ্বান ও স্লোগান প্রতি মুহূর্তে শুনা যাচ্ছিল। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হল, العزة لله। আল্লাহর জন্যে বা এমন বাক্য কখনও শুনা যায়নি। অথচ আরব বাহিনীর সকল সেনা সদস্যই মুসলমান ছিল। মুসলমান কখনও মানব আবিষ্কৃত মতবাদ এবং মিথ্যা অহঙ্কারের উপর ভিত্তি করে প্রাণ-বিসর্জন দিতে পারে না। একমাত্র লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর কালিমাই তাকে রক্তস্নানে উদ্বেলিত করতে পারে। আগুনে ঝাঁপ দিতে দ্বিধাহীন উৎফুল্ল করে তোলতে পারে।

প্রেসিডেন্ট জামাল আব্দুন নাসের তার এক বক্তৃতায় পরাজয়ের কারণসমূহ ব্যাখ্যা করতে যেয়ে ইসরাইলের অমর শক্তি তাদের চেয়ে তিনগুণ বেশী হওয়াটাকে অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন। তার এই বর্ণনা তার জন্য নিতান্তই প্রযোজ্য। কিন্তু ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে কি পাকিস্তানের চেয়ে তিনগুণ বেশী সামরিকশক্তি ভারতের ছিল না? কিন্তু

www.pathagar.com

বিশ্ববাসী দেখে নিয়েছে যে, পাকিস্তানের মুষ্টিমেয় সেনা সদস্য ভারতের টেক্কবহর রুখে দিল। কারণ এ যুদ্ধে জাত, বর্ণ ও রাষ্ট্রীয় কোন ভ্রান্ত চিন্তাধারা ও মতবাদের উপর ভিত্তি করে তারা লড়েনি; বরং এর ভিত্তি ছিল শুধুমাত্র লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুর অমোঘ বাণী। যা পড়ে তদানীন্তন পাক রাষ্ট্রপ্রধান খায়বার থেকে সিলেট পর্যন্ত প্রতিটি নাগরিকের অন্তরে ইসলামের জন্য প্রাণ বিসর্জনে এক অলৌকিক প্রেরণা ও ব্যাকুলতা সৃষ্টি করেছিলেন।

এই পরাজয় ইসলাম ও মুসলমানের নয়, আরব জাতীয়তাবাদের

৩. আমরা ইসলামী শিক্ষা থেকে দূরে সরে গিয়েছি। পশ্চিমা চিন্তাধারা, চলন-বলন ও রীতি-নীতি, অবাধ আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের চূড়ান্ত পর্যায়ে আজ আমাদের অবস্থান। শত্রুর প্রতিরোধে অত্যাধুনিক সামরিক সরঞ্জামাদি ও আধুনিক সমরনীতি অবলম্বন করতে ইসলাম যে অত্যাবশ্যক গুরুত্ব দিয়েছে তার প্রতি আমাদের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। যার অন্যতম পরিণতি হচ্ছে শত্রুর মোকাবিলায় ভীতিপ্রদ কোন প্রস্তুতি নিতে পারেনি আরবরা। ফলে তারা বিগত কয়েক দশক যাবত ইসরাইল আতঙ্কে ভুগছে। ইসরাইল রাষ্ট্র কায়েমের অশুভ উদ্দেশ্য কখনও গোপন ছিল না এবং তাদের যুদ্ধংদেহী বা জঙ্গীবাদী মনোভাব সর্বদাই প্রকাশমান ছিল। তারপরও আরবরা এর মোকাবিলায় স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে আদৌ সচেষ্ট ছিল না।

প্রচুর প্রাকৃতিক খনিজ সম্পদ ও জনবল আররদের আছে। তেল, যাকে আধুনিক বিশ্বের প্রাণ বলা যায়। সেই তরল ঐশ্বর্যের একমাত্র ইজারাদার বলতে গেলে তারাই। অথচ তারা প্রকৃতির মহামূল্য তরল নেয়ামতকে পুরোপুরিভাবে প্রকাশ্য ইসলামবিরোধী অমুসলিমদের হাতে ছেড়ে দিয়েছে। পক্ষান্তরে নিজেরা শুধু রয়্যালিটি প্রাপ্তিতে সীমাহীন আত্মতুষ্টিতে ভাসছে এবং প্রকৃতির এই অনুদানের একমাত্র যোগ্যপ্রার্থী ও ব্যবহারকারী হিসেবে তারা নিজেদেরকে মনে করছে। বস্তুত তাদের এ অবস্থা ভোগ-বিলাসে সীমাহীন মত্ততা ছাড়া অন্য কোন বিশেষণে ভূষিত করা যায় না। পরিতাপের বিষয়,

www.pathagar.com

বিগত প্রায় পাঁচ দশকেও আরবরা তেলের খনি থেকে তেল উত্তোলনের পদ্ধতি জানে এমন কোন লোকবল সৃষ্টি করতে পারেনি। যারা নিজেদের এই মহামূল্য সম্পর্কে বিদেশী দখলদারী থেকে মুক্ত করতে পারত। মহামূল্য এই খনিজ সম্পদের শুধু রয়্যালিটিতে যে প্রবৃদ্ধি অর্জন হয়, তা তুলনামূলকভাবে উন্নত বিশ্বের সামগ্রিক প্রবৃদ্ধির চেয়ে বেশী। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের মত বিশ্বের অন্যতম বড় ব্যাংকের দুই তৃতীয়াংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় শুধু কুয়েতের জমাকৃত অর্থ থেকে। অন্যান্য ধনী-আরব রাষ্ট্রসমূহ ইউরোপ ও আমেরিকার ব্যাংকগুলোতে যে অর্থ-কড়ি জমা রাখে তা অনুমান বহির্ভূত। উল্লেখ্য, এ বিশাল অর্থ-কড়ির বলেই আজ ইউরোপ আমেরিকা সমগ্র বিশ্বব্যাপী প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করছে এবং এসব অর্থ-কড়ির ব্যবসায়িক মুনাফা এককভাবে পশ্চিমাবিশ্বই ভোগ করছে– মুসলিমবিশ্ব নিধন মিশনে যারা সিংহভাগ সম্পত্তি ব্যয় করে থাকে।

এবার প্রশ্ন হলো, এই অর্থ কি আরবরা নিজেদের কাছে রেখে ইসলামীবিশ্বের পুনর্গঠন ও উন্নয়নে ব্যয় করতে পারত না? বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে যা প্রতীয়মান হচ্ছে তাতে পশ্চিমাদের কাছে অর্থ জমা করার মতলব নিম্নরূপ–

* পশ্চিমারা তেল উত্তোলন ও ব্যবহারের যে মূল্য বা বিনিময় প্রদান করে সেটাকে আবার ওদের কাছেই ফেরত দিয়ে তা থেকে ওদের লাভবান হওয়া নিশ্চিতকরণ।

* ওদেরকে শিল্পবাণিজ্য ও বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি উন্নয়নে সহায়তাকরণ এবং সে উন্নত প্রযুক্তির অত্যাধুনিক সামরিক সরঞ্জাম ইসরাইলকে সরবরাহকরণ।

* আমাদের অর্থ দিয়েই আমাদেরকে বোম্বিং করার বিমান তৈরিতে সহায়তা দান।

* অপরদিকে আমরা ওদের দয়া ও অনুগ্রহের আশায় সর্বদা ব্যাকুল হয়ে থাকি। ফলে যখনই আমাদের কোন উন্নয়ন কাজের প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন সে জমাকৃত অর্থ থেকেই সাহায্য নামে যৎসামান্য কিছু ফেরত দেয়া হয়। আর তখন সমগ্র বিশ্বব্যাপী ওদের দানশীলতা ও বদান্যতার প্রশংসা বাক্যের স্তুতি পড়ে যায়।

www.pathagar.com

পশ্চিমাদের কাছে জমা দেয়ার পর আরবরা যৎসামান্য অর্থ নিজেদের কাছে রাখে তাও কিন্তু অল্পস্বল্প নয়; সেটাও বিরাট পরিমাণ। কিন্তু এই অর্থ কিসের পেছনে ব্যয় করছে এবং কি জন্যে ব্যয় হচ্ছে? শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গাড়ী, সুখ-স্বাচ্ছন্দের অত্যাধুনিক উন্নততর উপকরণ, অশ্লীল ছায়াছবি, মদ, বাচ্চাদের দামী খেলনা এবং অপরিমিত ভোজনপ্রিয়তার পিছনেই তো সব ব্যয় হচ্ছে। আরবদের প্রতিটি ঘরেই টিভি, ভিসিআর, ডিস ও অশ্লীল ফিল্মের ব্যাপক সমারোহ। সড়ক ও মহাসড়কে যে পরিমাণ কেডালক গাড়ি দৌড়াতে দেখা যায়, সেনাবাহিনীতে সে পরিমাণ সৈন্য পাওয়া যাবে না। পুরাতন মডেলের সামান্য কিছু অস্ত্র। যেমন– কুয়েতের মত ধনী রাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর সদস্য সংখ্যা সর্বসাকুল্যে পাঁচ হাজার এবং যুদ্ধ বিমান মাত্র আটটি।

মারাত্মক ভীতপ্রদ ব্যাপার হচ্ছে, গত কয়েক দশক যাবত ইসরাইলের সামরিক বাহিনীতে নতুন ও কিশোরদের হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ আরবদের যৎসামান্য সেনা সদস্য যাও আছে, তাও আবার তাদের উন্নততর কোন প্রশিক্ষণ নেই। ইসরাইলীরা তাদের বাজেটের সিংহভাগই প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় করে। পক্ষান্তরে আরবের প্রতিটা লোকই ভোগ-বিলাস ও বিনোদনকে টাকা খরচ করার সর্বাধিক উপযুক্ত ক্ষেত্র মনে করে। ইসরাইলীরা দিনকে দিন উন্নত থেকে উন্নততর নতুন নতুন অস্ত্র উদ্ভাবনে সার্বক্ষণিক ব্যস্ত। অন্যদিকে আরবরা ঘরে ঘরে টেলিভিশন নিয়ে সার্বক্ষণিক মশগুল। ট্যাংকের শক্তি ও ক্ষমতা যেখানে ইসরাইলীরা দিন দিন বৃদ্ধি করছে, সেখানে আরবদের মাঝে গাড়ীতে এয়ারকন্ডিশন লাগানোর হিড়িক পড়েছে। কারিগরি ও টেকনোলজির ক্ষেত্রে অধিকতর উন্নয়ন সাধনে ইসরাইল যখন দিবা-রাত্রি প্রয়াস চালাচ্ছে। আরবরা তখন গান-বাজনা, সঙ্গীত ও চিত্ত বিনোদনের পেছনেই সময় ব্যয় করাকে শ্রেয় মনে করছে। পশ্চিমাবিশ্বে বিভিন্ন জঙ্গীবাদী ও সন্ত্রাসী দল ও রাষ্ট্র ইসলামকে ধ্বংস করতে যখন ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে, আরবরা তখনও ঐক্যের ভিত্তি খোঁজে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে আল্লাহপাক আরবদের পরাজয়ের গ্লানি ছাড়া আর কি-ই বা দিতে পারেন!

www.pathagar.com

৪. ইসলামীবিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টার পরিবর্তে অন্যের উপর নির্ভরশীলতাকে গুরুত্বারোপ।

ইন্দোনেশিয়া থেকে মরক্কো পর্যন্ত সমগ্র মুসলিমবিশ্ব ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজেদের সমস্যা নিজেরা সমাধান করার চেষ্টা করলে আজ আমেরিকা কিংবা রাশিয়ার প্রতি মুখাপেক্ষী হওয়ার প্রয়োজন হত না। পাশ্চাত্যের পক্ষপাতিত্ব ও দায়িত্বহীনতা আজ সুস্পষ্ট। আরব-ইসরাইল যুদ্ধে রাশিয়ার প্রতি আরবদের যথেষ্ট আস্থা ও নির্ভরতা ছিল যে, রাশিয়া তাদেরকে সামরিক সহযোগিতা করবে। অথচ এক্ষেত্রে রাশিয়ার লজ্জাজনক নির্লিপ্ততা বিশ্ববাসী হতবাক হয়ে অবলোকন করল। যুদ্ধের পরে ইসরাইলের বিরুদ্ধে তাদের বক্তৃতা-বিবৃতি বেশ জোরে-শোরেই চলল। জাতিসংঘের অধিবেশনে ইসরাইলের বিরুদ্ধে নিন্দা এবং আরবদের পক্ষে সহযোগিতা করার বক্তব্য দিল। কিন্তু কথা হচ্ছে, শুধু মুখের কথায় কি নিপীড়িত মানবতার উপশম হবে? দুঃখী মানুষের দুঃখ ঘুচবে? অনস্বীকার্য বাস্তবতা হল, পাশবিকতা ও হিংস্রতা প্রতিরোধে মিষ্টি কথায় কোন কাজ হবে না; বরং তরবারীই-এর একমাত্র উপযুক্ত ফয়সালাকারীর যোগ্যতা রাখে। অত্যাচারীর নিন্দা কেবল মুখে নয় স্বহস্তে করতে হবে। সত্যিকার অর্থে ইসরাইলীদের মাঝে যদি চরিত্রের ও ভদ্রতার ন্যূনতম প্রভাব থাকত এবং সর্বজনবিদিত জাতিসংঘের নীতিমালার প্রতি সামান্যতম গুরুত্ব তাদের কাছে থাকত, তাহলে আর মধ্যপ্রাচ্যে ফিলিস্তিন সমস্যার সৃষ্টি হত না। ইসরাইল তো একটা বিষাক্ত অজগর সাপ। বিবেক-বুদ্ধির দোহাই দিয়ে যার প্রতিরোধ সম্ভব নয়। একে প্রতিরোধের পথ একটাই, তাহল এমনভাবে আঘাত করা যাতে সে আর কখনও মাথা উঁচু করার সাহস না পায়।

যুদ্ধের দামামা বেজে উঠার পরও নিশ্চুপ ও নির্লিপ্ত থাকা। অতঃপর মজলুমদেরকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করার যাবতীয় আয়োজন সমাপনের পর শোরগোল করা কোন বন্ধুত্বের কাজ হতে পারে না। কোন মজলুম যদি বাস্তবিকই এমন কোন লোককে বন্ধু ভেবে ভুল করে ফেলে, তবে তার এই সরলতা ও বোকামির জন্যে দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া আর কি-ই বা করার

www.pathagar.com

আছে! রাশিয়ানরা এখন আরবদের জন্যে যে মায়াকান্না করছে বাস্তবতার আলোকে একে এই ব্যাখ্যা দেয়া ছাড়া অন্য কোনভাবেই বিশ্লেষিত করা যাবে না। অবশেষে হয়ত দেখা যাবে ইসরাইল বারগেনিং (Bargaining) করে বায়তুল মুকাদ্দাস ও আকাবা উপসাগরকে জাতিসংঘের নিয়ন্ত্রণাধীন দিয়ে দিতে আরবদের স্বীকৃতি আদায় করে নেবে (উল্লেখ্য, এখনও এর প্রয়োজন হয়নি; বরং ইসরাইল নিজেই স্বাভাবিকভাবে তার নিয়ন্ত্রণ বহাল রেখে চলেছে) এবং এই যুদ্ধে এটাই হবে ইসরাইলের জন্যে সবচেয়ে বড় সফলতা।

আরবদের পরাজয়ের যেসব কারণ উপরে উল্লিখিত হয়েছে, সেগুলো কোন জটিল বিষয় নয় এবং এসব ঘটনার সময়ও আজানা নয়। এমন কোন দর্শনেরও বর্ণনা দেয়া হয়নি সেখানে, যা অনুধাবন করতে দীর্ঘ প্রমাণাদির প্রয়োজন হবে। বরং এসব আমাদের চোখের সামনেই সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনা ও বিষয়। যা আজ প্রতিটি সচেতন মুসলমানই অনুভব করছেন।

এ পরাজয় সমগ্র মুসলিমবিশ্বের জন্যে এক বিরাট আঘাতস্বরূপ। এ পরাজয় একটি প্রাকৃতিক চপেটাঘাত– যা আমাদেরকে সজাগ ও সতর্ক হওয়ার আহ্বান করছে। আর যদি আমরা আত্মহত্যার দৃঢ়সংকল্প নিয়ে চুপ করে বসে থাকি তাহলে এসব অবহেলা ও অসচেতনতার যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদানে পুরোপুরি প্রস্তুত থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে, ইসরাইল কখনও স্বেচ্ছায় আগ্রাসন বা সর্বগ্রাসী কার্যক্রম বন্ধ করবে না। যতক্ষণ না সমগ্র মুসলিমবিশ্ব এটা প্রমাণ করে দেবে যে, মুসলমানরা এমন জাতি যাদের সাথে লড়াই বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা মানে নিজেদেরকে শেষ করে দেয়া, টুকরা টুকরা করে ফেলা। শুধু মুখে বলার সময় শেষ হয়ে গেছে। এখন কাজের সময়। এখনও যদি আমাদের হুঁশ ও সচেতনতা না আসে, তাহলে ভয়ঙ্কর পরিণতি ভোগ করতে হবে। ইসরাইল আজ বায়তুল মুকাদ্দাস ও সিনাই উপত্যকা দখল করে নিয়েছে। কাল কায়রো, দামেস্ক ও বাগদাদ, রিয়াদ তার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবে। এভাবে একে একে মুসলিমবিশ্বের সামান্য একটু জায়গাও এই খোদায়ী আযাব থেকে বাঁচতে পারবে না।

www.pathagar.com

এই পরাজয় যদি আমাদের মাঝে সচেতনতা জাগরুক করে, কর্মস্পৃহা ও উদ্যম সৃষ্টি করে, তাহলে এ পরাজয় কোন কিছুই নয়। বরং এতেই সফলতা বয়ে আসবে। অন্যদিকে আমরা যদি প্রকৃত মুসলমান হয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে পারি, তাহলে শুধু ইসরাইল কেন পৃথিবীর কোন শক্তিই আমাদের প্রতি চোখ তুলে তাকাতে পারবে না।

হে প্রভু! আমাদেরকে এ আঘাত সহ্য করার যোগ্যতা দাও! যেসব পাপের কারণে আজকে আমাদের এই অপমানজনক পরিণতি, তা থেকে আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আগামীদিনে সত্যিকার মুসলমান হয়ে বাতেল ও তাগুতি শক্তির মোকাবেলা করার তাওফিক দাও! আমাদের বিচ্ছিন্নতা ও বিক্ষিপ্ততাকে ঐক্যে পরিণত করে দাও! আর এই জাতি (মুসলমান) যারা গত দু'শত বছর যাবত ভাগ্যের ফেরে পড়ে আছে তাদেরকে আরেকবার পৃথিবীতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সুযোগ দানের সাথে সাথে আখেরাতেও তাদেরকে চূড়ান্ত সফলতা দান কর।

www.pathagar.com

মুসলিমবিশ্বের মূল সমস্যা

বায়তুল মুকাদ্দাসের উপর ইসরাইলের অবৈধ দখলদারিত্বের প্রায় অর্ধশতাব্দী হতে চলল। এ সময়ের মধ্যে এমন কোন উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি, যে কারণে পবিত্রভূমিতে ইসরাইলী দানবের জবরদস্তিমূলক দখলদারিত্ব কায়েম রাখতে হবে। তারা সেখানকার দুর্বল ও নিরীহ মুসলমানদের উপর অবর্ণনীয় নির্যাতন করে চলেছে। বায়তুল মুকাদ্দাসের পবিত্র আঙ্গিনায় নগ্ন ও অশ্লীল কর্মকাণ্ড করছে। সেখানে সৈনিকদের প্যারেড করে তাদের অবৈধ দখলদারিত্বের অপরাধ প্রদর্শনী করছে। মোটকথা, অসভ্য ও বর্বর কোন শত্রুর পক্ষ থেকে যেসব আচার-ব্যবহার হওয়ার কথা তা সবই হয়েছে।

পক্ষান্তরে আমাদের অবস্থা দেখুন! এই দুঃখ ও হতাশাজনক পরাজয়ে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের বিশেষ বৈঠকের প্রয়োজন আছে কি না– এটাই আমাদের কাছে সুস্পষ্ট নয়। এ শৈথিল্যের দরুন ইসরাইলের হাত দিনকে দিন বড় হচ্ছে, সাহস বৃদ্ধি পাচ্ছে। দীর্ঘ এ সময়ের মধ্যে আমাদের পক্ষ থেকে প্রতিরোধমূলক কোন প্রতিউত্তর দেয়া হয়নি।

৫ই জুনকে প্রতিবাদ বা বিক্ষোভ দিবস হিসেবে চালু করে এই দিনে সমগ্র মুসলিমবিশ্বে ইসরাইলের দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে মিছিল, সমাবেশ ও বক্তৃতার মাধ্যমে প্রতিবাদের ঝড় তুলবে হবে। এত বড় জুলুম ও অন্যায়ের ব্যাপারে একেবারে নীরব থাকা থেকে এমন প্রতিবাদী কিছু কথাও তো মন্দ নয়। বস্তুত বায়তুল মুকাদ্দাস উদ্ধার ও মুক্ত করার জন্য যে দালান ও ফটক সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর অশ্বারোহী সৈনিকদেরকে আগুন ও রক্তের সাথে হুলি খেলতে দেখেছে, সেই ঘর উদ্ধারের এ চেষ্টা তেমন কিছু নয়। অরপরও গত কয়েক বছরে মধ্যপ্রাচ্যের কিছু কিছু রাষ্ট্রপ্রধান একান্তভাবে ব্যক্তিগত উদ্যোগে ৫ই জুন 'গরম বক্তৃতা' ও বিক্ষুব্ধ স্লোগানের প্রদর্শনী করে সামান্য কিছু চেষ্টা করে আসছেন। কিন্তু এ চেষ্টার উদাহরণ ঠিক ঐ লোকের মত, যার শরীরে প্রচুর ব্রণ ও ফোঁড়া উঠার দরুন সে তার রক্তের পরিশুদ্ধি চিন্তা না

www.pathagar.com

করে কেবল বাহ্যিক ঔষধ ব্যবহার করে উপশমের ব্যবস্থা করতে চায়। ইসরাইল মুসলিমবিশ্বের জন্য একটি রক্তাক্ত জখমী। আর এর চিকিৎসা কেবল উপরাংশে পাউডার বা মলম ব্যবহার করলেই হবে না। কারণ, এ ধরনের চিকিৎসা দ্বারা যদিও বিষাক্ত উপসর্গ থেকে সাময়িক নিষ্কৃতি লাভ করা যায়, কিন্তু কিছুদিন পর শরীরের অন্য অংশে এই উপসর্গের আত্মপ্রকাশ আবার ঘটে। সুতরাং আমাদের মূলচিন্তা ও গবেষণার বিষয় হচ্ছে ঐ বিষাক্ত পাদর্থটি কি? যা কখনো ফিলিস্তিন সমস্যা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, আবার কখনো কখনো সাইপ্রাস, কাশ্মীর, ইথিওপিয়া, ইরাক, আফগানিস্তানে এর বিষাক্ত ছোবল পরিলক্ষিত হয়। আমাদের মধ্যে এর অনুপ্রবেশ ঘটলই বা কি করে? অধিকন্তু এর থেকে মুক্তির পথই বা কি ?

বিষয়টি দীর্ঘ হলেও জটিল নয়। এ প্রসঙ্গে মহাগ্রন্থ আল-কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

وعدالله الذين امنوا منكم وعملوا الصلحات ليستخلفنهم فى الارض كما استخلف الذين من قبلهم.

অর্থ: "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে আল্লাহপাক তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, নিশ্চয়ই তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে তার খেলাফত প্রদান করবেন। যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে খেলাফত দান করেছিলেন।" (সূরা আন নূর, আয়াত-৫৫)

আমরা যদি বিশ্বাস করি যে, বিশ্ব পরিমণ্ডলের সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা ও মালিক একমাত্র আল্লাহ এবং তাঁর আদেশ ব্যতীত এখানে কিছু হতে পারে না। পৃথিবীতে যত ধরনের বিপ্লব ও পরিবর্তন ঘটেছে সব তাঁরই আদেশ ও ইচ্ছাই ঘটেছে। আমরা যদি আরও বিশ্বাস করি যে, পবিত্র কোরআন আল্লাহর কালাম এবং তাতে একটি শব্দও ভুল নেই। তাহলে আমাদেরকে গভীরভাবে চিন্তা ও উপলব্ধি করতে হবে, আমাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য পবিত্র কোরআনের এই ওয়াদা কেন পূরণ করা হচ্ছে না? পৃথিবীতে আমাদের শক্তি অর্জিত হচ্ছে না কেন? আমরা ভয়-ভীতি থেকে নিরাপদ হতে পারছি না কেন? তাহলে কি আল্লাহপাকের এই অঙ্গীকার প্রতারণামূলক? (নাউযুবিল্লাহ) একটু ন্যায়নীতির

www.pathagar.com

সাথে গভীর চিন্তা করলে আল্লাহপাকের এই অঙ্গীকারের যথার্থতা ও সত্যতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। কেননা, ইসলামী ইতিহাসের প্রথম যুগে বিশ্ববাসী এই অঙ্গীকারের অপরূপ কারিশমা অবলোকন করেছে। বস্তুত বর্তমানে আমাদের যে বিপর্যয় ও দুরবস্থা তা মূলত ঈমান ও সৎকর্মশীলতার ঘাটতি ও অভাবের অনিবার্য ফল। যা পবিত্র কোরআনে ঐ অঙ্গীকারের জন্য পূর্বশর্ত হিসেবে সাব্যস্ত করেছে।

নিকট অতীত ইতিহাসের প্রতি সামান্যতম দৃষ্টিপাত করলেও একথার সত্যতা ও যথার্থতার প্রমাণ পাওয়া যাবে। বস্তুত আমাদের সামগ্রিক বিপর্যয় শুরু হয়েছে তুরস্কের খেলাফতে উসমানিয়ার পতন থেকে। তখন মুসলিমবিশ্ব যে দূরবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল মূলত তা ছিল ইসলামের শত্রুদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পেতে রাখা ফাঁদে জড়িয়ে যাবার অনিবার্য ফল। যা আমরাও বেশ আগ্রহবশতই গ্রহণ করেছিলাম। সেই ফাঁদ হচ্ছে, পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা। যে প্রসঙ্গে লর্ডম্যাকেলের ভাষ্য– "এই শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুসলমানদের মধ্যে এমন এক প্রজন্ম সৃষ্টি করা, যারা বর্ণ ও বংশের ক্ষেত্রে স্বগোত্রীয় হলেও মন-মানসিকতা, চিন্তা-চেতনা ও রীতি-নীতির ক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গ ইংরেজ হবে।" যে শিক্ষা ইউরোপে নবজাগরণ সৃষ্টি করেছিল, সেই শিক্ষার সাথে মুসলমানরাও পরিচিত হয়ে উঠবে এটাতো বেশ সুন্দর প্রস্তাব। কিন্তু যে নীতি ও পদ্ধতির উপর স্থাপিত ঐ শিক্ষা ব্যবস্থা তা যুবকদের চিন্তা-চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন ঘটাবে। তাতে মুসলিম যুবকদেরকে নিজের পারিবারিক জীবনদর্শন সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ রাখা হয়েছে। পক্ষান্তরে পাশ্চত্য জীবনদর্শনের প্রীতি ও শ্রেষ্ঠত্বকে ওদের কোমল হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে গেঁথে দেয়া হয়েছে। ফলে এদের জীবনদর্শন আমূল পবির্তন হয়ে গেছে। যে দীনের মধ্যে ওদের যাবতীয় উন্নতি ও সাফল্য নিহিত ছিল সেই দীনের প্রতি ওদের কোন খেয়াল নেই। সেই দীন বরং আজ বাস্তব জীবনে সঙ্গতিহীন পূর্বসূরীদের এক পবিত্র সম্পদ হিসাবেই গণ্য।

মুসলমানদের মধ্যে এই বিষাক্ত ছোঁয়ার যে বিস্তৃতি ঘটেছে এর তালিকা বিরাট দীর্ঘ। তবে এর মধ্যে অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হচ্ছে (Nationalism) জাতীয়তাবাদ ও আঞ্চলিকতা, যা মুসলমানদের পাহাড়সম দৃঢ়তাপূর্ণ ঐক্যকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিয়েছে। ইসলামের শত্রুরা হাজার বছর

www.pathagar.com

অনুধাবন করেছিল যে, মুসলিম ঐক্যই তাদের জন্য সব থেকে বড় বাধা। তাই ওরা ওদের শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদের আঞ্চলিক ধারণা এমনভাবে প্রচার ও প্রসার করতে লাগল, যেন এছাড়া মানুষ সভ্যই হতে পারে না। ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থায় প্রভাবাধীন ঐসব যুব শ্রেণী, যারা পশ্চিমা যে কোন স্লোগানকেই গ্রহণ করতে পূর্ব থেকেই প্রস্তুত থাকে।-তারা এই দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গিকে সাদরে গ্রহণ করে ঐ ফাঁদে জড়িয়ে গেল– যা তাদের জন্য পেতে রাখা হয়েছিল।

আরব দেশগুলোর জাতীয়তাবাদের (Nationalism) ইতিহাস পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এই মতবাদের সেখানকার একেবারে প্রথমদিকের প্রবক্তা হয় খৃষ্টান, না হয় ইহুদী। বর্তমান যুগের ওরিয়ান্টালিস্ট ফিলিপ্প হিট্টি তার 'ইসলাম ও পাশ্চাত্য' নামক গ্রন্থে লিখেছেন–

> "বস্তুত এ এলাকায় (আরব অঞ্চলে) সিরিয়া ও লিবিয়ার খৃষ্টানরাই এই পাশ্চাত্য উপকরণ ও ধ্যান-ধারণার (Nationalism) ভিত্তি স্থাপন করেছে। পক্ষান্তরে মিশরে বৃটেনের ঔপনিবেশিক শাসনের সময় থেকে ঐসব কবি ও সাংবাদিক এ সম্পর্কে স্বাধীনভাবে লেখালেখি শুরু করে এমন উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে, যা (Nationalism) জাতীয়তাবাদের 'অগ্নি স্ফুলিঙ্গ' প্রজ্জ্বলিত করেছিল। মতবাদটির মত নতুন নতুন শব্দ চয়ন করে পুরাতন শব্দগুলোকে সংশোধন ও উন্নয়ন করা হয়। কারণ, খেলাফতে উসমানিয়ার বেষ্টনী থেকে বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন হওয়া মূলত এ মতবাদ প্রতিষ্ঠার উপর নির্ভর ছিল। (Islam and the west, New york, ১৯৬২, p. ৯১)

নিকট অতীতের আরব ইতিহাসবেত্তা জর্জ এন্তোনিয়ুসের (George Antonius) 'দ্যা আরব জাগরণ' (The Arab Awak) বইয়ে বিষয়টিকে আরও বিশদ ও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি লিখেন–

> "সুলতান আব্দুল হামীদ ক্ষমতারোহণের দুই বছর পূর্বে ১৮৭৫ সালে বৈরুত সিরীন প্রোটেস্টান্ট কলেজে পড়ুয়া পাঁচ খৃষ্টান ছাত্র সর্বপ্রথম আরব জাতীয়তাবাদের সাংগঠনিক

www.pathagar.com

তৎপরতা শুরু করে একটি গোপন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। অতঃপর তারা মুসলমানদেরকে এর সাথে জড়িত করার প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে লাগল এবং অল্পকিছু দিনের মধ্যেই তারা বিভিন্ন ধর্মের ২২জনকে নিজেদের সংগঠনের সদস্য করে নিল।"

এই বইয়ে আরেকটু পরে যেয়ে জর্জ এন্তোনিয়ুস লিখেছেন–

"আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী শীর্ষস্থানীয় দুইজন হচ্ছে নাসেফ ইয়াযুজী ও বুট্রুস বুস্তানী। উভয়ই লেবাননী খৃষ্টান ছিল। 'দেশপ্রেম ঈমানের অংশ' এই স্লোগান সর্বপ্রথম বুট্রুসই উত্তোলন করেছিল।"

লেখক এ-ও লিখেছেন যে,

"প্রথমদিকে মুসলমানরা এ আন্দোলনকে তেমন পছন্দ করেনি; বরং বেশ খারাপ বলেই মনে করত। কিন্তু পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে তারাও এ বিষয়ে একমত হয়ে গেল।"

এন্তোনিয়ুসের ভাষ্যে–

"So it came to pass that the ideas which had originally been sown by the chirstians were now roughly at the-turn of the century finding an increasingly receptive soil among the Muslim."

অর্থাৎ "যার ফলাফল হচ্ছে, যে মতবাদের বীজ বপন করেছিল মূলত খৃষ্টানরা, সেই মতবাদ মুসলমানদের মধ্যে ধীরে ধীরে বেশ সাদরে গৃহীত হল এবং তা যথেষ্ট উর্বরক্ষেত্র পেয়ে গেল।"

অনুরূপভাবে তুর্কি-যুবকদের উপর এ শিক্ষার প্রভাবে তুর্কি জাতীয়তাবাদের ভূত সওয়ার হল। সেখানেও এ মতবাদের স্থপতি হচ্ছে

www.pathagar.com

খৃষ্টান। তুরস্কের জনপ্রিয় লেখিকা খালেদা আদীব খানম তার Conflict East and West in turkey বইয়ে লিখেছেন–

> "একদিকে তুর্কি মুসলমান যুবকরা গণতন্ত্রের দাবী উঠাল, অন্যদিকে ওসমানী সালতানাতের খৃষ্টান অধিবাসীরা জাতীয়তাবাদের ষড়যন্ত্র করল।" (পৃষ্ঠা-৫১)

এভাবে ওরা (খৃষ্টানরা) আরব ও তুর্কিদেরকে পরস্পরের বিরোধিতায় উদ্বুদ্ধ করল। ফলে সমগ্র মুসলিমবিশ্ব যেখানে ওসমানী খেলাফতের অধীনে এক ও অভিবক্ত ছিল, তা নিমিষে বিভক্ত হয়ে গেল। অতঃপর এসব বিচ্ছিন্ন ছোট ছোট দেশকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে কিছুদিন রাখার পর ইসলামের শত্রুরা স্বাধীনতা দিয়েছে বটে। কিন্তু নতুন শিক্ষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে মুসলমানদের মানসিকতার আদল পরিবর্তন হওয়ায় চেতনা ও বাস্তবতার ক্ষেত্রে তারা মূলত আজীবন পাশ্চাত্যের নিয়ন্ত্রণাধীনই থেকে গেল।

আধুনিক মিশর (Modern Egypt) বইয়ে লর্ড ক্রমার (Lord Cromer) ইংরেজদের কর্মকৌশল যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে যেয়ে লিখেছেন–

> "ইংল্যান্ড তার সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন এলাকাকে যত শীঘ্র সম্ভব স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত ছিল। কারণ, সেসব এলাকায় ইতোমধ্যে এমন রাজনৈতিক প্রজ্ঞাসম্পন্ন লোক তৈরি হয়ে গিয়েছিল, যারা পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির পূর্ণ ধারক-বাহক হিসেবে নিজ নিজ দেশ শাসনে ছিল প্রস্তুত। কিন্তু–
>
> Under no circumstances would the British Government for a single moment to create an independent Islamic state"
>
> অর্থাৎ, "এসব এলাকায় স্বাধীন ইসলামী সরকার কোন অবস্থাতেই এক মুহূর্তের জন্যও বৃটিশ সরকার মেনে নিতে প্রস্তুত নয়।"

মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের শত শত বছরের পরিশ্রমের ফল হচ্ছে এই জাল বা ফাঁদ, যা শেষ পর্যন্ত সত্য সত্যই কার্যকর হল। প্রথমত

www.pathagar.com

মুসলিমবিশ্বকে ছোট ছোট দেশে বিভক্ত করে স্বাভাবিকভাবেই দুর্বল করে দেয়া হয়েছে। এবার ওদের উপর পাশ্চাত্য সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তি বাধাহীন হয়ে গেল। যাকে ইচ্ছা সরাসরি গোলাম বানিয়ে রাখল। আর যাকে ইচ্ছা শর্তের উপর নামের স্বাধীনতা দিল। কিন্তু তাকেও এমন এমন স্থায়ী সমস্যায় জড়িয়ে রাখল, যে সমস্যার আদৌ কোন সমাধান সম্ভব নয়।

এই সেই উদ্দেশ্য যা ওসমানী খেলাফত টিকে থাকা পর্যন্ত পশ্চিমারা কখনও অর্জন করতে পারেনি। কারণ, শেষ পর্যন্তও ওসমানী খেলাফত মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ অভিন্ন প্রাচীর ও দুর্গ হিসেবেই কাজ করেছে এবং এর কারণে মুসলমানদের অধিকার হরণ করা যে কারো জন্যে বিরাট দুরূহ ব্যাপার ছিল। ফিলিস্তিন সমস্যার প্রতি লক্ষ করলেই বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। শত শত বছর পূর্ব থেকে এই এলাকা ইহুদীদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত। ফলে বৃটেন যখন ইহুদীদেরকে উগান্ডায় আবাস গড়ার প্রস্তাব করে তখন তারা তা অস্বীকার করে। বরং এর পরিবর্তে ফিলিস্তিনে আবাস গড়ার উদ্দেশ্যে ১৯০২ সালে সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামীদের কাছে Theodore Herzl কে প্রধান করে একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে। তাদের পক্ষ থেকে সুলতানকে ফিলিস্তিনে ইহুদীদের আবাস গড়ার অনুমতির বিনিময়ে তুরস্কের সমস্ত বৈদেশিক ঋণ আদায় করে দেয়ার প্রস্তাব করা হল। কিন্তু সুলতান এর প্রতিউত্তরে যা বলেছিলেন তা ছিল খেলাফতকে সব থেকে বড় শত্রু মনে করে যারা, সেই আরব জাতীয়তাবাদীদের জন্য বিরাট দিকনির্দেশনা ও পাথেয়। সুলতান আব্দুল হামীদের উত্তরটা Theodore Herzl তার নিজ ডাইরিতে এভাবে লিখেছেন–

> "D. Herzl কে জানিয়ে দাও! যতদিন ওসমানী খেলাফত থাকবে ততদিন যেন ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র বা শাসন কায়েমের অভিলাষ পরিহার করে। তা কেবল তখনই সম্ভব, যখন ওসমানী খেলাফত একটি অতীত ও স্বপ্ন হয়ে যাবে।" (Quoted by Myr. Ghulam Mohammad : of Indonesia Muslim News Karachi, May 1968 p. 8)

সুলতান আব্দুল হামীদের এই উত্তরের পর ওসমানী খেলাফতের বর্তমানে ফিলিস্তিনে ইহুদী বসতি স্থাপনে ওরা সম্পূর্ণভাবে নিরাশ হয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

অতঃপর খেলাফতের উপর আঘাত করার পুরো চেষ্টা শুরু করে। পশ্চিমা শিক্ষার বিস্তৃতি ঘটিয়ে ধর্মহীনতা ও জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে তারা নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিলে সফলতা পেয়ে যায়। পক্ষান্তরে ওসমানী খেলাফত সত্যিই কাল্পনিক ও অতীতের হয়ে পড়ে। এর ফলাফল হিসেবেই আজকের ইসরাইল নামক ইহুদী রাষ্ট্র। শুধু এক ইসরাইলই নয়; বরং মুসলিমবিশ্বের সামগ্রিক সমস্যাবলী এরই ধারাবাহিকতাস্বরূপ।

এই নাতিদীর্ঘ আলোচনার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুসলমানদের মনোযোগকে এই দিকে আকর্ষণ করা যে, ঐসব সমস্যা ও বিপর্যয় থেকে সত্যিই যদি আমরা মুক্তি চাই, তাহলে গত দেড়শত বছর যাবত গৃহীত নিজেদের চিন্তা-চেতনা ও কর্মনীতির বিবেচনা ও বিশ্লেষণ করতে হবে।

আমাদের মূল সমস্যা পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ, যা আমাদের স্বতন্ত্র জীবনধারাকেই বিনাশ করে দিয়েছে। ফলে পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আমাদের শক্তির মূল উৎস ঈমান ও সৎকর্মশীলতা থেকে আমরা অনেক দূরে সরে গিয়েছি। আমাদের অবস্থা পথহারা ঐ পথিকের মত, যে পথ হারিয়ে প্রতারণার শিকার হয়ে নিজের সর্বনাশ নিজে ডেকে আনে। আমরাও প্রতারণার শিকার হয়ে কেবল ধ্বংস আর অধঃপতনের পথেই চলছি। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হল, বার বার প্রতারিত হওয়ার পরও আমরা আবার প্রতারণার শিকারে পরিণত হচ্ছি। আর ঐসব প্রতারকচক্র আমাদেরকে ধ্বংসের জন্য নতুন নতুন গর্তের ও ধ্বংসের পথ দেখিয়ে দিচ্ছে।

দুঃখজনক ব্যাপার যে, এই সত্য ও বাস্তবতাটুকু এখনও মুসলিমবিশ্ব উপলব্ধি করতে পারেনি। ইসরাইলের কাছে আমাদের একের পর এক পরাজয়ের পরও আমাদের হুঁশ হল না, চৈতন্য ফিরল না। প্রথম কেবলা বায়তুল মুকাদ্দাস পতনের চেয়েও মারাত্মক ব্যাপার-এই ঘটনা থেকে আমাদের কোন শিক্ষা গ্রহণ করতে না পারা। আমাদের, বিশেষ করে আরববিশ্বের জীবনধারা মূলত পাশ্চাত্যের ধর্মহীন জীবন-পদ্ধতিরই অন্ধ অনুকরণ। যা একদিকে ভোগ-বিলাসের উদ্দীপনাকে যেমন চরম আগ্রহী করে তুলেছে, অন্যদিকে তেমনি কর্মস্পৃহা ও উদ্যমশীলতার প্রতি অনাগ্রহ সৃষ্টি করেছে এবং আল্লাহ ও ইসলামের পরিবর্তে 'আরব জাতীয়তাবাদ', 'মাতৃভূমিপ্রীতির' স্লোগান ও আন্দোলনের পেছনে মরিয়া হয়ে লেগে এবং পারস্পরিক অনৈক্যের দরুন আজ আমরা ছিন্ন-ভিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হয়ে আছি।

www.pathagar.com

৫ই জুনকে কেবল ইহুদী অবৈধ দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ নয়; বরং নিজেদের ঐ মানসিক রোগের প্রতিষেধক হিসেবেও গ্রহণ করতে হবে। যার কারণে আজ ইহুদীদের মত বর্বর সম্প্রদায়কে নিয়ে আমাদেরকে গভীরভাবে ভাবতে হচ্ছে। ইসরাইলের দখলদারিত্ববিরোধী বিভিন্ন প্রস্তাব ও পদ্ধতি অবলম্বনের সাথে সাথে আমাদের মন-মানসিকতা ও অন্তরে ইসরাইলের পৃষ্ঠপোষক ও পাশ্চাত্যের ধ্যান-ধারণার যে দখলদারিত্ব জেঁকে বসে আছে, এর বিরুদ্ধেও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। অনারবদের অবৈধ দখল থেকে যেমন ফিলিস্তিন স্বাধীন ও মুক্ত করার দৃঢ় অঙ্গীকার করতে হবে, তেমনি ঐসব অনারব চিন্তা-চেতনার প্রভাব থেকেও নিজেদেরকে মুক্ত করতে হবে, যা আমাদেরকে আমাদের দীন, ঈমান এবং সিরাতে মুস্তাকিম থেকে দূরে সরিয়ে ধর্মহীনতা, প্রবৃত্তি পূজা, ভোগ-বিলাসিতা ও চৈতন্যহীনতার বশবর্তী করেছে। যার কারণে আজ আমরা অন্যদের খেলনায় পরিণত হয়েছি। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা 'পাশ্চাত্য অনুকরণের' মত ভয়ঙ্কর প্রবণতা প্রতিরোধ করতে না পারব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের উপর 'ইসরাইলের মত' হাজার হামলা আপতিত হবে। কারণ, এসব সাময়িক ব্যবস্থায় পরিকল্পিত ঐসব সমস্যার কোন সমাধান বয়ে আনতে পারবে না।

কিছুদিন পূর্বে ফিলিস্তিনের প্রধান মুফতি পাকিস্তান সফরে আসলে রাওয়ালপিণ্ডিতে এক বক্তৃতায় বলেন–

> "ওসমানী খেলাফতের পতনের পর সমগ্র মুসলিমবিশ্বের দৃষ্টি এখন পাকিস্তানের প্রতি নিবদ্ধ। যাকে সমগ্র মুসলিম জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দু মনে করা হয়। কারণ, বর্তমান বিশ্বে পাকিস্তানই একমাত্র দেশ যা ইসলামের নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।"

বিজ্ঞ মুফতি সাহেবের এই বিশ্লেষণ শতভাগ বাস্তব ও যথাযথ। তাই পাকিস্তানের জনগণ ও শাসকদের দায়িত্ব হল অতীতের তিক্ত-অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সমগ্র মুসলিম জাতির মনোবাসনা পূরণ করা এবং পাশ্চাত্য অনুকরণের ধ্বংসাত্মক পথ পরিহার করে ইসলাম প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করা। যা কেবল পাকিস্তানের শান্তি, নিরাপত্তা ও উন্নতি সাধন করবে না; বরং সম-সাময়িক অন্যান্য মুসলিম দেশকেও বর্তমান দুরবস্থা থেকে মুক্তি দিয়ে শান্তি ও নিরাপত্তার পথে উদ্বুদ্ধ করবে।

(দৈনিক ইনকিলাব: ১৬/১১/০২ইং, ২৩/১১/০২ইং)

www.pathagar.com

মুসলিমবিশ্বের ঐক্য ভাবনা

গত কয়েক শতাব্দী যাবত মুসলমানরা যে দুঃখজনক বিপর্যয়ের সম্মুখীন এর বিভিন্ন কারণ বিশ্লেষণ সম্পর্কিত এ পর্যন্ত অনেক কিছুই লেখা হয়েছে। তবে এ প্রসঙ্গে শায়খুল হিন্দ হযরত মাহমুদুল হাসান (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত দুটি বাক্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বস্তুত তিনি ছিলেন খোদাপ্রেমে চির আত্মহারা সেসব মানুষের একজন, যারা শত শত বছর যাবত দারুল উলূম দেওবন্দে বসে কোরআন ও হাদীসের দরস দিয়েছেন। কিন্তু যখনই উপমহাদেশকে ইংরেজদের দাসত্ব থেকে মুক্ত ও স্বাধীন করার মনোবাসনা তাদেরকে অস্থির করে তুলেছে, তখন তারা দারুল উলূমের সেই খেজুর পাতার মাদুরে বসেই ভারত স্বাধীনতার এমন মহাসংগ্রাম গড়ে তুললেন, যার একপ্রান্ত কাবুল এবং অন্যপ্রান্ত কনস্টান্টিনিপোল পর্যন্ত স্পর্শ করেছিল। যার দরুন মাল্টার বন্দীশালায় তাঁকে তিন বছর কারাভোগ করতে হয়।

পাকিস্তানের সাবেক প্রধান মুফতি হযরত মুফতি শফী (রহ.) বলতেন, শাইখুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান (রহ.) মাল্টার কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর একদিন দারুল উলূম দেওবন্দ মাদ্‌রাসার ছাত্র শিক্ষকদের সামনে বক্তৃতা করতে গিয়ে বলেছিলেন–

> "আমি আমার সমস্ত জীবনে একটিমাত্র শিক্ষা পেয়েছি, আর তা হচ্ছে মুসলমানদের পতনের দু'টি কারণ। এক. কোরআন ছেড়ে দেয়া, দুই. নিজেদের মধ্যকার পারস্পরিক মতানৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা। এখন আমার জীবনের মিশন হল, এই দুইটি কারণ অপসারণের চিন্তা। কোরআনের শিক্ষা ও প্রচার এবং মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির লক্ষ্যে নিজের সামগ্রিক সামর্থ ব্যয় করা।"

বস্তুত মুসলমানদের ইতিহাস নিয়ে যতই গবেষণা করা হবে এতে তাদের পতনের মূল কারণের সারসংক্ষেপ এই দুটি বিষয়ই হবে। ফলে আজকের এই দিনেও মুসলমানদের সাফল্য ও উন্নতি এ দুইটি বিষয়ের

www.pathagar.com

উপরই নির্ভর করছে। যুগ যুগ ধরে ইসলামের শত্রুরা মুসলমানদের ধ্বংসের চেষ্টা করে আসছে। এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তারা সম্ভাব্য সকল অস্ত্রই প্রয়োগ করেছে। প্রথমদিকে অস্ত্রের বলে ওরা মুসলমানদের দমানোর চেষ্টা হিসেবে বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী দল ও শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালিয়েছে। কিন্তু আল্লাহপাক মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে এমন অপরাজেয় করে দিয়েছিলেন যে, সমস্ত ইসলামবিরোধী শক্তি এক হয়েও তাদের সাথে লড়াই করে কেবল নিজেদেরই ধ্বংস ডেকে এনেছে। পরবর্তীতে ওরা তথ্য-উপাত্ত ও দর্শনের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে পরাজিত করতে চেয়েছে। কিন্তু একথা সুস্পষ্ট যে, তথ্য-উপাত্ত, দলিল-প্রমাণ ও দর্শনের ক্ষেত্রেও ইসলামের সমকক্ষ কিছু নেই। এ ক্ষেত্রেও শত্রুরা মুসলমানদের সাথে কুলিয়ে উঠতে পারেনি।

অতঃপর ইসলামের শত্রুরা মুসলমানদের ধ্বংসের জন্য এমন মারাত্মক ও বিষাক্ত কৌশল অবলম্বন করল, যার আক্রমণ থেকে আজ পর্যন্তও মুসলমানরা মুক্ত হতে পারছে না। আর তা হচ্ছে, মুসলমানদেরকে কোরআন ও হাদীসের শিক্ষা থেকে পশ্চাতগামী করে, তাদের মধ্যে বংশ ও বর্ণবাদের শ্রেণী সমস্যা সৃষ্টি করা এবং ভাষা ও আঞ্চলিকতায় পারস্পরিক বিবাদে জড়িয়ে দেয়া। এভাবে মুসলিমবিশ্বকে আভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্রের ফাঁদে আটকে এক সাথে দু'টি উদ্দেশ্য হাসিল করে নিচ্ছে। একদিকে মুসলমানদের মধ্যে ধর্ম ও খোদাদ্রোহী শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন করা, অন্যদিকে বংশ ও অঞ্চলপ্রীতিতে উদ্বুদ্ধ করে এক অঞ্চলের লোকজনকে অন্য অঞ্চলের লোকজনের বিরোধিতায় লিপ্ত করে রাখা। দুর্বলতা সত্ত্বেও ওসমানী খেলাফতের শেষদিন পর্যন্তও মুসলমানদের জন্য তা একটি শক্ত ঘাঁটি হিসেবেই ছিল, যার প্রতি চোখ উঠিয়ে তাকালেই শত্রুদের কাঁপন ধরে যেত। কিন্তু যখন আভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্রে তাদের মধ্যে আরবী ও তুর্কি সমস্যা দেখা দিল, তখন সেই অপরাজেয় দুর্গটি ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল। যেসব ছোট ছোট এলাকা খেলাফতের সময়ে সাধারণ জেলার পর্যায়ে ছিল, সে সব আজ সহসাই স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হল। ফলে যে মুসলিমবিশ্বের ভয়ে পৃথিবীর সব বৃহৎ শক্তি সর্বক্ষণ কম্পমান থাকত, তা আজ পাশ্চাত্যের এমন শিকারে পরিণত যে, সেখানে মুসলমানদের কোন অধিকারই নেই।

www.pathagar.com

নিকট অতীতের শেষ পর্যায়ে যখন সমগ্র পৃথিবীতে মুসলমানদের পতন ঘটতে ছিল ঠিক তখনই তারা অনায়াসে এমন এক গুরুত্বপূর্ণ উপকরণের অধিকারী হল, সমগ্র ইসলামী ইতিহাসে যার কোন দৃষ্টান্ত নেই। পৃথিবীর মানচিত্রের প্রতি লক্ষ করলে দেখা যাবে, প্রকৃতি মুসলিম দেশগুলোকে ভৌগোলিকভাবে এক শিকলে বেঁধে রেখেছে। মরক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত প্রায় সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্র সীমান্ত পরস্পরে মিলিত। গোলাকৃতির এ পৃথিবীতে প্রাকৃতিকভাবে মুসলিমবিশ্ব যে অংশের ভাগীদার হয়েছে, তা মূলত সমগ্র পৃথিবীর হৃদপিণ্ডের মত।

পৃথিবীর বড় বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ শহরসমূহ তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন। খনিজ পদার্থে আল্লাহপাক তাদেরকে সমগ্র বিশ্ববাসীর থেকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। বিংশ শতাব্দী থেকে মূলত মানুষের জীবনধারা 'তেলের' উপর নির্ভর। এসব এলাকায় সেই তরল ঐশ্বর্যেরই মালিকানা তাদেরকে দেয়া হয়েছে। এমনকি একথা প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল যে, "যেখানে মুসলমান সেখানে তেল"। বিশ্ববাসী অবলোকন করেছে যে, কিছু আরব দেশ কয়েক মাস তেল সরবরাহে সামান্য বিঘ্ন সৃষ্টি করে সমগ্র পশ্চিমাবিশ্বকে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছিল। মানব সম্পদের দিক দিয়েও মুসলিমবিশ্ব যথেষ্ট প্রাচুর্যপূর্ণ। পৃথিবীর এক পঞ্চামাংশে আমাদের বসতি। এই মুহূর্তে বিশ্বে যতগুলি রাজনৈতিক ঐক্য আছে এর মধ্যে কোন একটাও সংখ্যার দিক থেকে মুসলমানদের সমকক্ষ নয়। আমেরিকান, রাশিয়ান, আফ্রিকান ঐক্যের সব অধিবাসী পৃথক পৃথকভাবে আমাদের থেকে কম। চীন কেবল জনসংখ্যার দিক দিয়ে মুসলমানদের সমান। তারপরও স্থান বা ভৌগোলিক পরিধির ক্ষেত্রে চীনও অনেক পেছনে। এই বিরাট সংখ্যার জনগণ পৃথিবীর এমন অংশে বসবাসরত, যা ইতিহাসের সমস্ত সাংস্কৃতিক বিপ্লবের জীবন্ত সাক্ষী। অথচ প্রকৃতির অকৃত্রিম দান এই তরল ঐশ্বর্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও বর্তমানে আমরা হচ্ছি পৃথিবীর সর্বাধিক বঞ্চিত, অসম্মানিত ও দুর্বল জাতি। যার মূল কারণ অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা। যেমন জাতিসংঘে মুসলিম সদস্য রাষ্ট্র সংখ্যা প্রায় চল্লিশের মত এবং আফ্রিকা মহাদেশীয় রাষ্ট্র সংখ্যাও প্রায় এমনই। অথচ

www.pathagar.com

আফ্রিকান ঐক্যের দৃঢ়তা বিশ্ববাসীকে অভিভূত করছে। সময়ে তারা জাতিসংঘকে তাদের দাবী ও প্রস্তাব মানতে বাধ্য করছে। পক্ষান্তরে মুসলিম রাষ্ট্রের সংখ্যা বেশী হওয়ার পরও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তাদের কোন সম্মানজনক স্থান নেই। তাদের কথার কোন গুরুত্ব নেই। যার একমাত্র কারণ হল, রাজনৈতিক ঐক্যের অনুপস্থিতি; বরং শত্রুরা তাদের ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করে পরস্পর বিবাদে জড়িয়ে রেখেছে। বিষয়টি একেবারে সুস্পষ্ট, যার জন্য কোন নাতিদীর্ঘ দার্শনিক আলোচনার প্রয়োজন নেই। মুসলিমবিশ্বের নেতৃবৃন্দের দায়িত্ব ছিল, ইসলামের শত্রুদের চালবাজি পুরোপুরিভাবে অনুধাবন করে এর প্রতিরোধের চিন্তা-ভাবনা করা। আজ থেকে বিশ বছর পূর্বে যদি মুসলমানরা এই প্রয়োজনীয়তার যথার্থ অনুভব করে মুসলিমবিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ করত তাহলে আজ বিশ্ব মানচিত্র অন্যরকম হয়ে যেত। মুসলিম বিশ্বকে আজ আমেরিকা, রাশিয়া ও চীনের আশ্রয় নেয়ার প্রয়োজন হত না। সমগ্র পৃথিবীই অত্যাচারিতদের আশ্রয়স্থল হত এবং মুসলিমবিশ্বের বুক চিরে ইসরাইল ও ভারতের মত এমন রক্তাক্ত ক্ষত সৃষ্টি হত না।

দেরীতে হলেও বিশ্বমুসলিম ঐক্যসংস্থা হিসাবে O.I.C বা ইসলামী সম্মেলন সংস্থা গঠিত হয়েছে। যুগ যুগ ধরে কোটি কোটি মুসলমান একান্তভাবে কামনা করে আসছিল এ ধরনের কোন সংস্থা প্রতিষ্ঠা, তা-ই বাস্তবায়িত হল। এখন কথা হচ্ছে, এই O.I.C র শীর্ষ সম্মেলন যেন শুধু আপ্যায়ন ও দেখা-সাক্ষাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে। বরং মুসলিমবিশ্বের ঐক্যের জন্য এমন এমন পদক্ষেপ নিতে হবে, যা মুসলমানদের মধ্যে নিজের শক্তি ও সামর্থের যথাযথ অনুভূতি জাগাবে এবং নবজীবনবোধ সঞ্চার করবে। পারস্পরিক বিবাদের ন্যায়সঙ্গত মীমাংসা হবে। অধিকন্তু মুসলিমবিশ্ব তার প্রাপ্য হারানো সেই গৌরব ও স্থান পুনরুদ্ধার করবে। নচেৎ মজলুম মুসলমানদের আশা-আকাঙ্ক্ষাই কেবল মাঠে মারা যাবে না; বরং সমগ্র মুসলিমবিশ্ব হতাশার অন্ধকার তিমিরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়বে।

(দৈনিক ইনকিলাব- ১৯/১২/০২ইং)

সমাপ্ত

www.pathagar.com

প্রকাশনায়

দারুল হক প্রকাশনী

১১০ আলীজা টাওয়ার (৩য় তলা), ফকিরাপুর, ঢাকা-১০০০